বর্গীগণ বহির্গত হইয়া নানা স্থানে লুণ্ঠন করিত। ঐ দুর্গ গড় মান্দারণ নামে অভিহিত। ইংরাজগণ বর্গীদিগকে দমন করিবার জন্য সময়ে সময়ে এখানে সৈন্য প্রেরণ করিতেন। কিন্তু তাহাতে অসুবিধা হওয়ায়, ইংরাজ রাজ কর্ণেল-গোলা, সিপাহি-বাজার প্রভৃতি স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেন এবং ক্রমে বর্গীদিগকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিয়া তাহাদের দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন। উপরোক্ত দুর্গে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজ সেনা রক্ষিত হয়। ঐ সময় ৺ দাতারাম মল্লিক ও ৺ ভগীরথ রক্ষিত প্রভৃতি কয়েক জন সমশ্রেণীর তাম্বূলি মিলিয়া ইংরাজ সৈন্যগণের রসদ সরবরাহ করিতেন। তাঁহারাও যাইবার কালে ঐ সকল রসদের মূল্য পরিবর্ত্তে প্রত্যুপকার স্মরণ করিয়া অনেক অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রদান করিতেন। এইরূপে তাঁহারা কিছু ধন সঞ্চয় করেন। যাহাহউক তৎকালে ৺ দাতারাম মল্লিক শিশু জন্মেজয়কে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠশালায় প্রেরণ করেন। জন্মেজয় শিক্ষা সমাপন করিয়া পিতার ব্যবসায় ও তেজারতি দেখিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ৺ দাতারাম মল্লিক অত্রস্থ ৺ প্রেমচাঁদ দের কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দেন। কিছুদিন পরে দাতারাম পাঁচ বা ছয় শত টাকা মাত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ঐ সময় জন্মেজয়ের বয়ঃক্রম ২০।২৫ বৎসর। পিতার মৃত্যুর পর, জন্মেজয় ঐ সামান্য অর্থ সাতিশয় অধ্যবসায় সহকারে ব্যবসায়ে নিয়োগ করেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই ঐ টাকা খাটাইয়া ব্যবসায় ও তেজারতিতে দ্বিগুণ লাভ করেন। যে সময় দাতারাম মল্লিক মণিঘাটী হইতে সদরে আইসেন, সেই সময় ৺ ভগীরথ রক্ষিতও কার্য্য সৌকর্য্যার্থে মেদিনীপুরে আসিয়া বসবাস করেন। উভয়েই এক জাতীয় ও এক স্থানীয় ছিলেন। অবস্থাও উভয়ের সমান ছিল। একই উপায়ে উভয়ে ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন ও সমভাবে কৃতকার্য্যও হয়েন। দাতারাম ও ভগীরথ উভয়ের যেরূপ সখ্যতা ছিল, তাহাদের পুত্রদিগের মধ্যেও তদ্রূপ সাতিশয় প্রণয় বদ্ধমূল হইয়াছিল।

জনশ্রুতি এইরূপ যে, জন্মেজয় মল্লিক প্রথম অবস্থায় এতাদৃশ ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন যে, কি পিতৃসঞ্চিত কি স্বোপার্জ্জিত অর্থের মধ্য হইতে যে কোন কারণেই হউক না কেন, এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে কাতর হইতেন।

এইরূপ ব্যয়কুণ্ঠতা-হেতুই তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। যাহাহউক, জমেজয় সঙ্গতিশালী হইয়া নানা প্রকার সৎকার্য্যে উপরোক্ত বাক্যের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, পরিশ্রমী, ক্রিয়াশীল, মিতব্যয়ী ও পরিণামদর্শী লোক ছিলেন। উত্তরপাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় যে জমীদারী ক্রয় করিতে হইবে, স্বয়ং তাহা বিশেষ রূপে দেখিয়া শুনিয়া তবে গ্রহণ করিতেন। ইনি যে সকল স্থানে জমীদারী ক্রয় করেন, প্রত্যেক জমীদারীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেব স্থাপনা করিয়া যান এবং বসতবাটীর সম্মুখে কাশী হইতে দ্বাদশটী শিব আনাইয়া দ্বাদশ শিব মন্দির ও রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৮০ সালে শিবালয় ও রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং ১২৮৩ সালের ২২শে পৌষ মঙ্গলবার সমাপ্ত হয়। উদ্যানবাটীর মধ্যেও ইহার প্রতিষ্ঠিত শিবালয় আছে। বাটীর সন্নিকটে (মীরবাজার) আরও দুইটী শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত ধনেশ্বরপুর গ্রামে তিনি ১০৮টী অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তুলা-পুরুষ-দান উপলক্ষে প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন ও নানা দিগ্দেশ হইতে অধ্যাপক মণ্ডলীকে আনাইয়া যথেষ্ট সমাদরে বিদায় ও পাথেয় প্রদানে তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তুলার সময় অন্য অন্য ধাতু অপেক্ষা রৌপ্যই অধিক প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সার্দ্ধ নব সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ, স্বজাতি, কুটুম্ব, ভিক্ষুক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোককেই সযত্নে ভোজন করাইয়া অশেষবিধ দানাদি করিয়াছিলেন। তুলা, শিব মন্দির ও রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা একই দিনে সমাহিত হয়। আবার ঐ দিনেই ইহার মধ্যমা কন্যার বিবাহ হয়। এতদুপলক্ষে কয়েক দিন যাবৎ দান ও ভোজনাদিতে অনেক অর্থ ব্যয় করেন। বাটীতে কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ রাধাকান্ত জীউ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার ও অপরাপর স্থানের দেব সেবার সুবন্দোবস্ত আছে। লোকহিতকর প্রত্যেক কার্য্যে ইহার মুক্তহস্ততা দেখা গিয়াছে। সাধারণের উপকারার্থ স্থানে স্থানে পথ, ঘাট, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব, রাস, জগদ্ধাত্রী, স্বরস্বতী, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দোল, শিবরাত্রি প্রভৃতি যে সময়ের যে পূজা, সকলই সমারোহের সহিত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যাহাহউক, উল্লিখিত কীর্ত্তি সকল আজও তাঁহার

সুনামের পরিচয় দিতেছে। ইঁহার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ যজ্ঞেশ্বর, ২য় যোগেন্দ্রনাথ, ৩য় যদুনাথ, ৪র্থ জ্যোতীন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ যামিনীনাথ। সন ১২৯৩ সালে চৈত্র মাসে জন্মেজয় পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ যজ্ঞেশ্বরও ১৩০৭ সালের ১৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার প্রায় ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৃতীয় পুত্র যদুনাথ কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলেন এবং অনুমান ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কালকবলিত হন। ব্যাধিগ্রস্ত থাকায় ইনি পিতার সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। জন্মেজয় মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ রাধাকান্ত জীউর নামে উইল করিয়া যান। এমন কি বসতবাটী পর্য্যন্ত দেবস্ব করিয়া যান। তদনুসারে আজ পর্য্যন্ত জমীদারীর দাখিলা রাধাকান্ত জীউর নামেই লিখিত হইয়া থাকে। সমস্ত সম্পত্তির আয় সর্ব্বাগ্রে দেব সেবার জন্য রক্ষিত হয়। অনন্তর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই উপস্থিত তিন সহোদরে বণ্টন করিয়া লন।

১২৯৪ সাল হইতে অর্থাৎ জন্মেজয়ের মৃত্যুর পর সম্পত্তি রিসিভারের তত্ত্বাবধানের অধীন রহিয়াছে। জন্মেজয় মল্লিকের সখা রমানাথ রক্ষিতের বংশধর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রক্ষিত এক্ষণে মেদিনীপুরের এক জন খ্যাতনামা জমিদার ও অবৈতনিক বিচারক বলিয়া সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে গণ্য।

বালেশ্বর রাজবংশ।

(ইংরাজি হইতে অনুবাদিত।)

প্রত্যেক লোকহিতকর কার্য্যে একাগ্রতা ও দানশীলতার জন্য এই বংশ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা উড়িষ্যার আদিম নিবাসী নহেন। অনুমান ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে এই স্থানে বাসস্থান নিরূপিত করেন।

ইঁহারা যে উচ্চবংশসম্ভূত, তদ্বিষয়ে খ্যাতি আছে। ইঁহারা জাতিতে তাম্বূলী। সৎশূদ্র মধ্যে নির্দ্দেশিত। তাম্বূলীদিগের মধ্যে অষ্টগ্রামী শ্রেণীভুক্ত। এই বংশ অতি প্রাচীন বলিয়া ইঁহারা গৌরব করিয়া থাকেন। অনুমান সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য হইতে এই বংশের ইতিহাস পরিষ্কাররূপে সংগৃহীত হইতে পারে। তৎকালে হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার অধীন

মায়াপুর গ্রামে ইঁহারা বসতি করিতেন। ঐ সময় এই গ্রাম অতিশয় জনাকীর্ণ ছিল; অবশ্য ইঁহারা বংশপরম্পরা বহুদিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তথায় কতদিনের বাস ছিল, এতকাল পরে অনুমান দ্বারা তাহা স্থির করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন দে হইতে এই বংশের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ। সাধারণতঃ তিনি "সারদে" বলিয়া পরিচিত এবং রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুর হইতে উর্দ্ধে নবম পুরুষে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মধুসূদন অনেক দিন মায়াপুরে বাস করেন। অবশেষে জনৈক মুসলমান ফৌজদারের (সামরিক শাসন কর্ত্তা) অত্যাচারে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। যে অবস্থায় ইনি আপন মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে অতীব ঔপন্যাসিক রহস্যাত্মক।

তৎকালে বঙ্গদেশ যথেচ্ছারিতায় পূর্ণ ছিল। ধন প্রাণ লইয়া নিরাপদে বাস কি প্রকার, অনেকেরই তাহা অজ্ঞাত ছিল। ধন, মান, স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং আরও যাহা কিছু মনুষ্যের আপন ও প্রিয় বলিতে আছে, তৎসমুদায়ই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মুসলমান শাসনকর্ত্তা অথবা তাহাদিগের প্রিয়পাত্রদিগের করায়ত্ত ছিল। অশুভক্ষণে তাৎকালিক জাহানাবাদ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মুসলমান ফৌজদার মায়াপুর নিবাসিনী একটি সুন্দরী তাম্বূলী যুবতীর রূপ মাধুরীর বিষয় শুনিয়াছিলেন। এবং কামান্ধ হইয়া যে কোন প্রকারে তাহাকে হস্তগত করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি বঙ্গেশ্বরের প্রতিনিধি—ধন অথবা ক্ষমতা কিছুরই অভাব ছিল না। সুতরাং তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কেহই দাঁড়াইতে সাহস করে নাই।

গ্রামস্থ অষ্টগ্রামী তাম্বূলীদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল এবং তাঁহারা কুলমর্য্যাদার উপর অচিন্তনীয় আঘাতের প্রতীকারে চিন্তাকুল হইলেন। নিঃসহায় অভাগাগণ হতবুদ্ধি হইয়া কি প্রকারে এই উপস্থিত বিপদ হইতে অব্যাহতি পান, তন্নিরাকরণে অশক্ত হইলেন। ইঁহারা সানুনয়ে যথেষ্ট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যাহার প্রতি তিনি অন্তঃকরণ নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই যুবতী ভিন্ন তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায়ের কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইল না। অতঃপর যখন তাঁহারা দেখিলেন, এত অনুনয় বিনয় সমস্তই বৃথা হইল, তখন একটী কুটিল উপায়াবলম্বনে মর্য্যাদা রক্ষার এক পন্থা আবিষ্কার করিলেন ও

ফৌজদারের কপট সখ্যতায় আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মধুসূদন দত্তের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ফৌজদারের হৃদয়-গ্রাহিণী কামিনীও ঐ বাটীতে ছিল। ফৌজদার মধুসূদনের গৃহে উপস্থিত হইয়া আপনাকে রমণীর সন্নিকটে স্থাপিত জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইলেন। অতঃপর যখন এই আনন্দের উৎস ছুটিতে ছিল, সেই সময় গৃহস্বামীর জনৈক ভৃত্য স্ত্রীবেশ ধারণ করতঃ গোপনে এক খানি শাণিত ছোরা দ্বারা ফৌজদারের জীবলীলা শেষ করে। এই প্রকারে তৎকালে তাঁহাদের বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা হয়। যাহাহউক, এই কার্য্যটী নীতির অনুমোদিত কি না বিবেচ্য। এই বিয়োগান্ত নাটকের প্রধান নায়ক মধুসূদন। এই অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য তিনি স্বজাতির নিকট অত্যধিক প্রশংসিত হইয়াছিলেন, এবং পুরস্কারস্বরূপ "সারদে" সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এই সম্মানের আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন। বংশপরম্পরায় অদ্যাবধি ঐ আখ্যা চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গেশ্বরের প্রতিনিধির কুঅভিপ্রায়ের প্রতিশোধ দিয়া তাম্বূলীগণ স্বদলে ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। কথিত আছে, সেই পর্য্যন্ত এই মায়াপুর গ্রাম অষ্টগ্রামী তাম্বূলীদিগের নিকট অভিশপ্ত। এখন পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ের তাম্বূলীদিগকে এখানে বাস করিতে দেখা যায় না। ঘটনাক্রমে যদি কেহ কোন সূত্রে এই গ্রামের নিকট দিয়াও গমন করেন, তিনি কদাচ বিশ্রামার্থ এস্থানে উপবেশন বা জল গ্রহণ করেন না। অতঃপর তাম্বূলীগণ আপনাপন জীবিকার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র অন্বেষণে পৃথক হইয়া পড়িলেন। কতকগুলি কলিকাতা, কতকগুলি মেদিনীপুর সহরে, কেহ কেহবা গয়েশপুর, কতকগুলি তমলুকে, আরও কতকগুলি বালেশ্বর এবং পিপলীতে বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। মধুসূদন দে অথবা সারদে ঘাঁটাল মহকুমার অন্তর্গত বাড়দা গ্রামে আপন বাসস্থান নিরূপণ করেন। অত্যধিক দূরতা হেতু তথায় মুসলমান শাসনকর্ত্তার প্রতি-হিংসার আশঙ্কা অতি অল্পই ছিল। এই স্থানে তিনি ইংরাজ কুঠিয়ালদিগের আশ্রয়ে নিরুপদ্রবে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইংরাজেরা সাধারণতঃ টুপিওয়ালা নামেই অভিহিত হইতেন। যাহাহউক, ইনি জীবনের অবশিষ্ট দিন ধর্ম্মনিষ্ঠায় বিশালাক্ষী দেবীর অর্চ্চনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মধুসূদন এক মাত্র পুত্র ঈশ্বর দেকে রাখিয়া প্রাচীন বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ঈশ্বর দে হইতে হৃদয়রাম দে পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষের মধ্যে কোন উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা দেখা যায় না। তবে ইহারা ইংরাজ কুঠিওয়ালার আশ্রয়ে পৈতৃক ব্যবসায়ের অনুসরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুখ শান্তি উপভোগ করিয়া-ছিলেন। অতঃপর হৃদয়রামের পুত্র জয়কৃষ্ণরাম ব্যবসার অধিকতর সুবিধা-জনক স্থানের জন্য ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করেন। ঐ সময় তাঁহার অবস্থা তাদৃশ সুপ্রসন্ন ছিল না। জয়কৃষ্ণ রামের ব্যবসায় বুদ্ধি অতি প্রবল ছিল। বাড়দা গ্রাম ব্যবসার অনুপযোগী বিবেচনায়, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ক্ষেত্রের জন্য এই উদ্যমশীল বণিক বালেশ্বর নগর বাসস্থানের উপযোগী বলিয়া স্থির করিলেন। তৎকালে ইহা একটি উন্নতশিল বন্দর ছিল। এই কারণে অনুমান ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জয়কৃষ্ণরাম তাঁহার তিনটী পুত্র লইয়া পৈতৃক গ্রাম ত্যাগ করতঃ এই স্থানে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। এই বংশের ইতিবৃত্ত এখান হইতে পরি-বর্ত্তিত দেখা যায়। এই সময় মিশরের সুলতানের সহিত ইংরাজদিগের একটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তদ্ধেতু এই প্রদেশের বাণিজ্য ব্যবসায় একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। জয়কৃষ্ণরাম ভাগ্যপরীক্ষার্থ দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পরিমাণে চাউল, বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন। যাহাহউক, তাঁহার এই উদ্যোগ বিফল হয় নাই। এতদ্দারা কেবল মাত্র যে তিনি প্রচুর লাভবান্ হইয়াছিলেন, তাহা নহে, এই সূত্রে কিছু ভূসম্পত্তিও ক্রয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিক দিন তিনি এই সম্পত্তি উপভোগ করিতে পান নাই। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে মাণিকরাম দে অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি উড়িয়া ও বাঙ্গালা জানিতেন। সংস্কৃত ও পারসী ভাষাতেও কথঞ্চিৎ অধিকার ছিল। পিতার ন্যায় ইনিও বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন। অনুমান ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বর-নিবাসী খ্যাতনামা অষ্টগ্রামী তাম্বূলী বাবু লাল বিহারী কর মহাশয় মাণিকরামের সুবুদ্ধি অবলো-কনে তাঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দেন। অতঃপর শ্বশুরের সাহায্যে মাণিকরামের ব্যবসায় আরও প্রসারিত হয় ও অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ উন্নতি হয়। সততা ও ধর্ম্মের সহিত কার্য্য করায়, আপন সুনাম প্রচারিত ও প্রভূত ধন উপার্জ্জিত হইয়াছিল। ইনিও বিস্তর ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মাণিকরাম তিনটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দয়ারাম, মধ্যম জগন্নাথ ও কনিষ্ঠ রঘুনাথ। দয়ারাম আপন মাতুল বাবু

জগন্নাথ প্রসাদ কর মহাশয়ের প্রশস্ত কারবার পরিচালন করেন। সৎবুদ্ধি ও ও সততার জন্য ইঁহার মাতুল ইঁহাকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন এবং সাধারণ লোকেও ইঁহাকে সম্মান করিত। ইনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন।

মাণিকরামের মধ্যম পুত্র জগন্নাথ আপন পিতার বিষয়কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। ঐ সময় বালেশ্বর ইংরাজাধিকারে ছিল, কিন্তু তৎকালে ইহা একটী স্বতন্ত্র জেলা ছিল না; তখন বালেশ্বর কটক, জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা মাত্র ছিল এবং তথায় একটি ছোট খাজনাখানা ছিল, একজন খাজাঞ্চিও নিযুক্ত থাকিত। গভর্ণমেণ্ট এই পদের উপযুক্ত লোক খুঁজিয়া না পাওয়ায়, জগন্নাথ দেকে মনোনীত করেন। জগন্নাথ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথের সাহায্যে খাজনাখানার কার্য্য চালাইয়া ছিলেন। কারণ উভয় ভ্রাতার মধ্যে তিনি কিছু অধিক শিক্ষিত ছিলেন। যাহাহউক, বর্ষত্রয়কাল পারকতা ও সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া জগন্নাথ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

রঘুনাথ ব্যবসায় বাণিজ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া রীতিমত ব্যবসার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সান নামে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কাপড় ছিল, ঐ কাপড় বালেশ্বরেই প্রস্তুত হইত। তিনি ঐ কাপড় প্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ড, পর্টুগাল, ডেনমার্ক এবং হলাণ্ডে রপ্তানি করিতেন। এতদ্ব্যতীত দাক্ষিণাত্যে চাউল ও কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃত এবং কড়ি পাঠাইতেন। এই সকল কার্য্যে তিনি প্রচুর ধন উপার্জ্জন করেন। রঘুনাথ এক জন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। ইনি লভ্যাংশের অধিকাংশই দান ধর্ম্মে ব্যয় করিতেন। ইনি কূপ ও পুষ্করিণী খনন, দেবালয় নির্ম্মাণ ও অপরাপর অনেক লোকহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইনি ব্রজমোহন, রূপচরণ, সনাতন এবং শ্যামানন্দ নামক চারিটী পুত্র রাখিয়া ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। পিতার জীবিতাবস্থার সময়েই ব্রজমোহন ও রূপচরণ অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তৃতীয় পুত্র সনাতনও পিতার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন। ইনিও অপুত্রক অবস্থায় জীবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার রাধানাথ নামক দত্তক পুত্র ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাল-

কবলিত হন। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের মৃত্যুতে কনিষ্ঠ শ্যামানন্দই সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইলেন।

সন ১২২৫ সালে ২৫শে ফাল্গুন তারিখে শ্যামানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। এই হিসাবে ধরিতে গেলে দেখা যায়, যৎকালে শ্যামানন্দের উপর বিষয় কর্ম্মের ভার ও সাংসারিক দায়িত্ব অর্পিত হয়, তখন ইঁহার বয়স ২৬ বৎসর মাত্র। ইনি সম্পূর্ণরূপে আপন পদের গুরুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। ধনবান পরিবারের যুবকগণ যেরূপ যৌবনসুলভ প্রলোভনে সদা রত থাকেন, ইনি সে প্রকার প্রলোভনে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া একমাত্র কর্ম্মেতেই মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইনি উত্তরাধিকারী-সূত্রে পিতৃ-পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া আপন পারদর্শিতা ও সতর্কতার সহিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করায় ও তৎসহ সততা ও পরিমিতাচার, থাকায়, কেবল যে ঐ সকল সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহা নহে, অসংখ্য ধর্ম্মকার্য্যে ও দানশীলতায় বংশ-গৌরব বৃদ্ধি করিয়া রাজা ও সাধারণের সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন।

শিক্ষা ও পথকর বিভাগের এবং মিউনিশিপাল সদস্য থাকিয়া শ্যামানন্দ অনেক লোক-হিতকর কার্য্য করিয়া যান। তাঁহার অসংখ্য প্রকাশ্য ও গুপ্ত দানের মধ্যে একটীতেই নামের মহত্ব প্রতিপন্ন হয়। তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষে (যাহা স্মরণ করিলে এখনও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে) তাঁহার মহত্ব ও অন্তরের স্বদেশানুরাগ প্রকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকস্থ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের শোচনীয় অবস্থা অবলোকনে সাতিশয় সন্তাপিত হইয়া নগরে অন্ন ছত্র খুলিয়া ছিলেন এবং দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিমিতরূপে অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। ইনি বর্ম্মা ও আরাকান হইতে বিস্তর চাউল আমদানী করিয়া সাহায্যপ্রার্থী আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসী ও প্রজাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রজাদিগকে প্রায় লক্ষ টাকা খাজনা ছাড় দিয়াছিলেন। বাস্তবিক ইহা বলা বাহুল্য নহে যে, তাঁহার মনের মহত্ব ও মানবের দুঃখ-মোচনের অশ্রান্ত চেষ্টা না থাকিলে, সেই স্থানীয় খ্যাত দুর্ভিক্ষে মৃত্যু-সংখ্যা সম্ভবতঃ অনেক অধিক হইত। ঐ সময় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহার মহৎ কার্য্য স্বীকৃত হয়।

ধর্ম্ম-বিষয়ে তাঁহার ঐকান্তিক ঔদার্য্য ও ব্যগ্রতা ছিল। তিনি এই সহরে নিমাকালী ও ঝাড়েশ্বরের মন্দির এবং রেমুনা গ্রামে গোপীনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। প্রাচীনত্বের নিদর্শন পুরীর জগন্নাথের যে গুণ্ডিচা মন্দির, যাহা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও তাঁহার গৌরব প্রকাশার্থ অদ্যাবধি তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান, অনেক দিন সংস্কারাভাবে সম্পূর্ণরূপে ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; শ্যামানন্দ দে ইহারই সংস্কার কার্য্যে অন্যূন অশীতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আপন নাম অজর ও অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এমন কি, এই অপরিসীম ব্যয়ের বিষয় জীবিতাবস্থায় তাঁহার সন্তানেরা পর্য্যন্ত জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। বাস্তবিক ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই মহৎ এবং সৎব্যক্তির অন্যান্য গুপ্ত দান আত্মশ্লাঘা ও আড়ম্বর শূন্য ছিল। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কি দিল, বামহস্ত তাহা জানিতে পারিত না।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ইনি গরীব দুঃখীদিগকে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। কি সহরে, কি মফস্বলে যেখানে উত্তম পানীয় জলের অভাব বোধ হইয়াছে, সেই খানেই ইনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া পুষ্করিণী ও কূপ খনন করাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অপরাপর ধর্ম্ম কর্ম্ম ও দানের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

(১) ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আপন নামে নামকরণ করিয়া সহরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। (২) ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রেমুনার মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের বুনিয়াদ নির্ম্মাণ করেন। (৩) ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এই সহরে ভিক্টোরিয়া জুবিলি নামক মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের বুনিয়াদ নির্ম্মাণ। (৪) ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েলসের ছাত্র-বৃত্তি ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য ৫০০০ হাজার টাকা দান। ঐ টাকা হইতে বালেশ্বর জিলা স্কুলের একটি প্রশংসের নিম্ন ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ বালককে প্রদত্ত হইত। কিছুদিন হইতে ঐ বৃত্তিভাণ্ডার ভদ্রকের উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়ের পোষণার্থ হস্তান্তরিত হইয়াছে। (৫) বালেশ্বর রাজবাটীর ঠিক-সম্মুখ ভাগে একটি সুবৃহৎ সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ এবং ইহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে (অর্থাৎ যখন কুলদেবতা রাধা গোবিন্দ জিউ এই মন্দিরে স্থাপিত হয়েন) প্রচুর ব্যয় ও এতৎসহ শিবের

সেবার জন্য চিরস্থায়ী রাজকীয় বন্দোবস্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ করণ। এখানে প্রত্যহ গরীবদিগকে ভোজন করান হয়। এবং (৬) সাধু, সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী ও অপরাপর দানপ্রার্থী ব্যক্তিগণের আতিথ্য সৎকারের জন্য সদাব্রত স্থাপন। এবং ১৮৭৪ সালে দেশীয় শিল্পকর্ম্মের উৎসাহ দানার্থে পারুয়াপদ গ্রামে তাঁহার উদ্যান বাটিকায় স্বদেশ জাত দ্রব্যের প্রদর্শনী উন্মোচন।

তাঁহার রাজভক্তি, দেশ হিতকর কার্য্যে উৎসাহ এবং দানশীলতা স্বীকার করিয়া গভর্ণমেণ্ট হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে বংশ পরম্পরায় "রায় বাহাদুর" উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছেন। ১৮৭৫ সালে "রাজা" (১৮৮৭) "রাজা বাহাদুর।" কিন্তু তিনি শেষোক্ত সম্মান অধিক দিন ভোগ করিতে পান নাই। ১৮৮৮ সালে অক্টোবর (১২৯৬ কার্ত্তিক) মাসে ৭১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্যামানন্দ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার দয়া ও দানশীলতা উড়িষ্যার লোক সহজে কখন ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার পত্নী শ্রীমতি রাণীকে অধিক দিন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। ইনি ১৮৯০ সালের আগষ্ট মাসে কালকবলিতা হন।

রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুর চারি কন্যা ও দুই পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে (এক্ষণে রাজা বাহাদুর) এবং কনিষ্ঠ কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দে। পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া কুমারদ্বয়ের প্রথম কার্য্য মহাসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ। ধরিতে গেলে ঐ অনুষ্ঠান জেলার মধ্যে অদ্বিতীয় এবং ইহাতে প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়। বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকল কুমারগণের মিতাচার ও সৎকারে এতাদৃশ আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, ১৮৮৮ সালের নভেম্বর মাসে তাঁহারা ইঁহাদিগকে বংশ পরম্পরায় "দেব" উপাধিতে ভূষিত করিয়া যান।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর জন্ম গ্রহণ করেন। স্থানীয় জেলা স্কুলে তাঁহার শিক্ষা লাভ হয়। ইনি দ্বাদশ হইতে বিংশতি বৎসর বয়সের মধ্যে লেখাপড়া সমাপন করত বিদ্যালয় ছাড়িয়া সাধারণ হিতকর কার্য্যে যোগ দান করেন। পিতার জীবিতকালে তাঁহার সহিত সকল প্রকার সাধারণ হিতকর কার্য্যে ও স্থানীয় সভাসমিতিতে ইনি প্রধান সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতেন।

১৮৭৭ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯০১ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ইনি

স্থানীয় মিউনিশিপালিটীর সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং ঐ সময়েই সভাপতি পদে উন্নীত হন। পরে সুখ্যাতি ও পারদর্শিতার সহিত তিন বৎসর কাল ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত ইনি বালেশ্বর পথকর সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৫ সালে অর্থাৎ জেলা বোর্ডস্থাপনের প্রারম্ভ হইতে ইনি সুখ্যাতি ও পারকতার সহিত বালেশ্বর জেলা বোর্ডের সহকারী সভাপতির কার্য্য চালাইয়া গভর্ণমেণ্ট ও সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইনি বিশেষ অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োজিত হন ও ইহার প্রতি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পিত হয়। ঐ কার্য্যও তিনি বিশেষ পারগতা ও দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মহা প্রদর্শনীতে ইনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া স্থানীয় কৃষি শিল্পের নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই কারণে এবং সর্ব্ব প্রথমে এই বিভাগে উড়িষ্যা ভাষায় "রিপণ ভূচিত্রাবলী" "Ripon Atlas" প্রকাশ করিবার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সদ্‌গুণের পুরস্কার স্বরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর এক খানি প্রশংসাপত্র ও তৎসহ "ব্রোঞ্জ" "Bronze" ধাতু নির্ম্মিত একটি পদক তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। তাঁহার রাজভক্তি, মিতব্যয়িতা, সাধারণ লোক হিতকর কার্য্যে যোগদান এবং সুখ্যাতির সহিত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য নির্ব্বাহ ইত্যাদি স্বীকার করিয়া গভর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এক খানি প্রশংসা পত্র দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইনি ছোট লাট বাহাদুরের মন্ত্রী সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। উড়িষ্যা হইতে ইনিই সর্ব্ব প্রথমে এই সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তিনি বর্ষত্রয়কাল পর্য্যন্ত (১৮৮৩—৮৬) এই দায়িত্ব পূর্ণ সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও পারদর্শিতার সহিত উপরোক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঐ সময় মন্ত্রী সভায় ১৮৮৪ সালের ৩ আইন অর্থাৎ বাঙ্গালার মিউনিশিপাল বিল লইয়া বিশেষ রূপ বাদানুবাদ চলিতে ছিল। ঐ আন্দোলনে মিউনিশিপাল কার্য্য সম্বন্ধে ইনি অনেক অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা প্রকাশ করেন।

লোক হিতকর কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ও তাঁহার দানশীলতায় গভর্ণমেণ্ট ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বিশেষ রূপে তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" পদবীতে ভূষিত করেন।

এক্ষণে রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর যে সকল অবৈতনিক কার্য্যে নিয়োজিত আছেন, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

(১) বালেশ্বর জেলা বোর্ডের সহকারী সভাপতি।

(২) প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত বিশেষ অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এবং বেঞ্চ ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সভাপতি।

(৩) স্থানীয় মিউনিশিপালিটীর কমিশনর।

(৪) ১৮৮৫ সাল হইতে বাঙ্গালার রাজকীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য।

(৫) বৌদ্ধদিগের টেক্সট্ সোসাইটীর সদস্য। (১৮৯২ সাল হইতে)।

(৬) কলিকাতার পশুশালার জীবিত বা চিরসদস্য (১৮৭৯ সাল হইতে)।

(৭) লেডি ডফারিণ ভাণ্ডারের জীবিত বা চির সদস্য। (১৮৯২)।

(৮) স্থানীয় জেলের অরাজকীয় পরিদর্শক। (১৮৯২)

(৯) বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য। (১৮৮৩) ইহার মধ্যে ১৮৯৭ সাল হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত বর্ষত্রয়কাল সহকারী সভাপতির পদে আসীন ছিলেন।

(১০) বালেশ্বর সংস্কৃত সমিতির সভাপতি।

ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি স্থানীয় জেলা স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৮৮ সালের মে মাসে ইনি বালেশ্বর স্থানীয় বোর্ডের সদস্য রূপে নিয়োজিত হয়েন এবং ১৮৯০ সালের আগষ্ট মাসে জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি হয়েন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কুমার সত্যেন্দ্রনাথ মিউনিশিপাল কমিশনর রূপে নির্ব্বাচিত হন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও বিশেষ পারকতা ও সুখ্যাতির সহিত ভারতবর্ষীয় দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহায্য ভাণ্ডারের স্থানীয় শাখার সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইনি হীরক জুবিলি সভার সভাপতিত্বে নিয়োজিত হয়েন এবং মহাসমারোহে

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী সাম্রাজ্য পরিচালনের উৎসবে ইনি অর্থ বা সামর্থ্যে কোন বিষয়েই ত্রুটি প্রদর্শন করেন নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইহার লোকহিতকর কার্য্যে উৎসাহ ও মিতব্যয়িতার জন্য ইহার সম্মানার্থ মহারাণী ভারতেশ্বরীর নামে এক খানি প্রশংসা পত্র অর্পিত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইনি স্থানীয় মিউনিশিপালিটীর অধীনে আদম সুমারির পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি বালেশ্বরের প্লেগ ভিজিল্যান্স কমিটির সদস্যরূপে কার্য্য করেন। ইনি কয়েক বৎসর যাবৎ বালেশ্বর সংস্কৃত সমিতির যুক্ত সভাপতির আসনে আসীন ছিলেন।

উপস্থিত ইনি নিম্নলিখিত সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন;—

(১) বালেশ্বর জেলা বোর্ডের সদস্য।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এবং অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের "এ" বেঞ্চের সভাপতি।

(৩) স্থানীয় মিউনিশিপাল কমিশনর।

(৪) বৌদ্ধ টেক্সট্ সোসাইটীর সদস্য।

(৫) জীবিত বা চিরসদস্য পাইকপাড়া বৃক্ষ বাটীকা উদ্যান।

এই দুই সহোদরের মধ্যে রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর নিঃসন্তান। কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দের মন্মথ নামধেয় এক পুত্র ও তিন কন্যা। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মন্মথ নাথের জন্ম হয়।

ইহাদিগের স্বর্গীয় পিতা যে সকল দানাদি ও ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, ইহারা উভয় ভ্রাতায় ঐ সকল ক্রিয়া কলাপ সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। বরং তদপেক্ষা কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহারা উভয়েই সাধারণ হিতকর কার্য্যে উদ্যুক্ত এবং কি প্রকাশ্য বা গুপ্ত কতকগুলি দানাদি সৎকর্ম্মে ইহারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

(১) ইহাদিগের স্বর্গীয় পিতার স্মরণার্থ জেলবাসীদিগের পানীয় জলের সুবন্দোবস্তের জন্য "শ্যামসাগর ভাণ্ডার" স্থাপন। (১৮৮৮)

(২) চাঁদবালী হাঁসপাতালে রোগীদিগের ঔষধ বিতরণার্থ "রাণী শ্রীমতি ভাণ্ডার" স্থাপন। (১৮৮৮)

(৩) "বেলী মেডাল" স্থাপন (১৮৮৮)। তাৎকালিক বঙ্গেশ্বর সার ষ্টুয়ার্ট কলভিন বেলী যে সময় বালেশ্বর পরিদর্শনে আইসেন, ঐ সময়েই ইহার প্রতিষ্ঠা হয় এবং বালেশ্বর জেলা স্কুলের মধ্যে প্রতি বৎসর যে ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে, তাহাকেই উপরোক্ত মেডেল প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(৪) ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে নালকুল রাস্তা নির্ম্মাণ। এই রাস্তা বালেশ্বর সহর হইতে নালকুল খাল ধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

(৫) ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বর জেলায় অনন্তপুর মধ্য বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(৬) ১৮৯১ সালে নভেম্বর মাসে তাৎকালিক বঙ্গেশ্বর সার চার্লস্ ইলিয়ট বাহাদুরের বালেশ্বর আগমন উপলক্ষে সোরোগ্রামে "ইলিয়ট দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন ও পরিচালন। উপরোক্ত গ্রাম জগন্নাথ ট্রঙ্ক রোডের ধারে অবস্থিত। সুতরাং ইহাতে সন্নিহিত গ্রামবাসী ও তীর্থযাত্রীগণের সমূহ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

(৭) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইহাদের পূজনীয়া মাতার সম্মানার্থ "রাণী শ্রীমতি স্ত্রীলোকদিগের দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন। ইহা নগরের ঠিক মধ্য স্থলে প্রতিষ্ঠিত। যে সকল স্ত্রীলোক পুরুষদিগের সহিত চিকিৎসিত হইতে অভিলাসী নহে, ইহা তাহাদিগের জন্য স্থাপিত।

(৮) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের অসাময়িক শোচনীয় মৃত্যুর স্মরণার্থ জলেশ্বরে "আলবার্ট ভিক্টর দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন।

(৯) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সাধারণের হিতার্থ নগর মধ্যস্থিত "রাণী সাগর" নামধেয় বৃহৎ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার।

(১০) ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে "মিস্‌ট্রেস্ স্মিথ পুরস্কার ভাণ্ডার" স্থাপন। জেলার মধ্যে মধ্যবঙ্গ পরীক্ষায় যে বালিকা উত্তীর্ণ হয়, ইহা তাহাকে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(১১) ১৮৯৩ সালে "রাজা শ্যামানন্দ বৃত্তি ভাণ্ডার" স্থাপন। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় যে বালক কৃতকার্য্য হয়, তাহাকে দেওয়া গিয়া থাকে।

(১২) ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ "বিদ্যা-

সাগর বৃত্তি" স্থাপন। এই বৃত্তি মধ্যইংরাজি বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ প্রকৃত নিঃস্ব বালকগণকে স্থানীয় জেলা স্কুলে পাঠ সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(১৩) ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নগরের কয়েকটী বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের উৎসাহার্থ "রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্যায়াম পুরস্কার" স্থাপন।

(১৪) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রপাড়া সাধারণ পুস্তকাগারের জন্য একটি উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ।

(১৫) ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুরের এবং রাণী শ্রীমতি দাতব্য ঔষধালয়ের স্ত্রী চিকিৎসক ও রাজকীয় হাঁসপাতালের সহকারী চিকিৎসকের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ।

(১৬) বালিপাল বাসতা রোডের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ। ইহার দূরত্ব তিন মাইলের অধিক হইবে।

(১৭) উড়িষ্যা ভাষায় কতকগুলি আবশ্যকীয় স্কুল পাঠ্য পুস্তক ও এক খানি মানচিত্র সঙ্কলন। অল্প মূল্য প্রযুক্ত গরীবদিগের ইহা দ্বারা সমূহ উপকার সাধিত হইয়াছে।

(১৮) জেলার চতুর্দ্দিকে জগন্নাথ ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ৪৯টী কূপের পঙ্কোদ্ধার এবং চাঁদবালী ও অন্যান্য স্থানে কূপ খনন।

(১৯) বালেশ্বরে কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ হল নির্ম্মাণ ও মেদিনীপুরে বেলী হল নির্ম্মাণার্থে এককালীন দান।

(২০) নিম্নলিখিত কয়েকটী দুর্ভিক্ষ দাতব্য ভাণ্ডারে প্রচুররূপে মাসিক চাঁদা বা দান।

(ক) মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ। ১৮৭৩
(খ) পুরী দুর্ভিক্ষ। ১৮৭৭
(গ) আইরিশ দুর্ভিক্ষ। ১৮৮০
(ঘ) নয়ানন্দ দুর্ভিক্ষ। ১৮৮৯
(ঙ) তালপদ দুর্ভিক্ষ। ১৮৯০
(চ) ভোগরাই দুর্ভিক্ষ। ১৮৯১
(ছ) কামারদা দুর্ভিক্ষ। ১৮৯১
(জ) ভারত দুর্ভিক্ষ বা ইণ্ডিয়ান ফেমিন। ১৯০০

বালেশ্বর রাজবংশের ধর্ম্মার্থ ও সাধারণ দানের তালিকা।

মন্দির	কোন সালে প্রস্তুত		আনুমানিক ব্যয়।
১। স্বপ্নেশ্বর, বালেশ্বর	১৮৩৫	...	৬০০্
২। নিমাকালী ঐ	১৮৩৬	...	৫০০্
৩। শ্রীমন্দির গোপীনাথ, রেমুনা	১৮৩৮	..	২০০০্
৪। ঝাড়েশ্বর, বালেশ্বর	১৮৪০	...	২৮০০্
৫। ধর্ম্মশালা ঐ	১৮৪১	...	২৫০০
৬। রামেশ্বর ঐ	১৮৪৪	...	১০০০্
৭। জগন্নাথ গুণ্ডিচা পুরী (সংস্কার)	১৮৫৯	...	৮০,০০০্
৮। রাধাগোবিন্দ জিউ, বালেশ্বর	১৮৮৮	...	২২.০০০
৯। শ্যামেশ্বর, বালেশ্বর	১৮৯৫	...	২০০০্

বিদ্যালয়।

			বাৎসরিক চাঁদা।
১। রেমুনা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়	১৮৬৪	...	২০০্
২। বালেশ্বর হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়	১৮৭২	...	২০০্
৩। বালেশ্বর ভিক্টোরিয়া জুবিলি মধ্য ইংরাজি স্কুল	১৮৮৭		৮০০্
৪। অনন্তপুর মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়	১৮৯১	...	২০০্
৫। বালেশ্বর সংস্কৃত সমিতি	১৮৯৩	...	১৫০্

এককালীন দান।

১। রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুরের দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণার্থ	...	১৮৭৪	২০০০্
২। রেমুনার স্কুল গৃহ নির্ম্মাণার্থ	১৮৬৮ এবং	১৮৯৩	৬০০্
৩। অনন্তপুরের স্কুল গৃহ „	...	১৮৯১	১৮৫্
৪। জলেশ্বরে "আলবার্ট ভিক্টর" নামীয় দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের ব্যয়		১৮৯১	১৬৫৫্

৫।	সোরো গ্রামে "ইলিয়ট" নামধেয় দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের ব্যয় ...	১৮৯১	১২০০
৬।	রাণী শ্রীমতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীলোকদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের ব্যয়	১৮৯১	২৫০০৲
৭।	উপরোক্ত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাকালীন ঔষধ, যন্ত্রাদি ও আসবাব আদির ব্যয়	১৮৯১	১৫০০৲
৮।	ঐ চিকিৎসালয়ে বিশেষ যন্ত্রাদি ক্রয়ার্থ ব্যয়	১৮৯১	৫৪০৲
৯।	রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুরের বাটী সংলগ্ন রাণী শ্রীমতীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ চিকিৎসকের বাস স্থান নির্ম্মাণ	১৮৯৮	৬৫০০৲
১০।	কলিকাতা ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে সাহায্য প্রদান	১৮৭৭	৫০০৲

পুস্তকালয় এবং সমিতি।

১।	বালেশ্বরে কৃষ্ণদাস পাল হল	১৮৮৪	২০০০৲
২।	মেদিনীপুরে বেলী হল এবং সাধারণ পুস্তকালয়	১৮৯৬	২৫০৲
৩।	বি, দে, সাধারণ সমিতি পুস্তকালয়	১৮৯৬	২৫০৲
৪।	কেন্দ্রাপাড়া সাধারণ পুস্তকালয় গৃহ	১৮৯৭	৩০০৲
৫।	বালেশ্বর জেলা স্কুল গৃহ নির্ম্মাণার্থ ব্যয়	১৮৭৪	১০০০৲
৬।	কটকে রাভেনসা কলেজ গৃহ নির্ম্মাণ	১৮৭৫	১০০০৲

পথ।

১।	নালকুল রাস্তা নির্ম্মাণের ব্যয়	১৮৮৯ ...	৪১০০৲

বৃক্ষাদি দ্বারা পথ সুসজ্জিত করণ।

১।	বাস্তা বালিপাল রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণের ব্যয় ১৮৭৭ ...	...	১২০০৲
১।	বালেশ্বরে রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ভূমি দান ১৮৭৪ বাৎসরিক আয়		৫১৭৲
২।	প্রিন্স অব-ওয়েল্‌সের বৃত্তি জন্য এককালীন মোট দান প্রতি বৎসরে ২০০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়া থাকে ১৮৭৫		৬০০০৲

৩। "শ্যামসাগর" বা "শ্যাম কিপ" যৌতুক ভাণ্ডারে ১৮৮৮ সালে ভূসম্পত্তি দান। প্রত্যেক বৎসর জেলাতে একটি করিয়া পুষ্করিণী খননার্থ ২০০৲ শত টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে।

৪। "রাণী শ্রীমতি যৌতুক" ভাণ্ডারে ১৮৮৮ সালে ভূসম্পত্তি দান। বাৎসরিক ১০৬৲ টাকা চাঁদবালী হাঁসপাতালের ঔষধ ক্রয়ার্থ ব্যয়িত হয়।

৫। সোরো, ইলিয়ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীদিগের ভরণ পোষণার্থ ভূসম্পত্তি দান, ১৮৯১, বাৎসরিক আয় ... ৩০০৲

৬। জলেশ্বরের আলবার্ট ভিক্টর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ভূসম্পত্তি দান, ১৮৯১, বাৎসরিক আয় ... ... ২৪০৲

৭। রাণী শ্রীমতি স্ত্রীলোকদিগের দাতব্য চিকিৎসালয়ে ভূসম্পত্তি দান, ১৮৯১, বাৎসরিক আয় ... . ৬০০৲

৮। বালেশ্বর জেলা স্কুলে "সার ষ্টুয়ার্ট বেলী মেডেল" প্রদানার্থ এককালীন নোট দান, ১৮৮৮ .. ... ৫০০৲

৯। শ্রীমতি স্মিথ্ পুরস্কার ভাণ্ডারে এককালীন নোট দান, যে সকল বালিকা মধ্যবঙ্গ পরীক্ষায় জেলা হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদের প্রদানার্থ, ১৮৯২ ... ... ৫০০৲

১০। বিদ্যাসাগর নিঃস্ব ভাণ্ডারে এককালীন নোট দান, যে সকল বালক অর্থাভাবে স্থানীয় জেলা স্কুলে পড়িতে অক্ষম, তাহাদের জন্য, ১৮৯৪ ... ... ৬০০৲

১১। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুরস্কার ভাণ্ডারে এককালীন নোট দান, ১৮৯৪, ইহা ব্যায়ামের পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ৫০০৲

১২। "রাজা শ্যামানন্দ বৃত্তি" উড়িষ্যার সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের জন্য, বৎসরে ৪০ টাকা প্রদত্ত হয়।

দুর্ভিক্ষ।

১।	উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ	...	১৮৬৬	...	১০০৫০০৲
২।	মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ	...	১৮৭৩	...	১০০০৲
৩।	পুরী দুর্ভিক্ষ	..	১৮৭৭	...	১২৫০৲

৪। আইরিস্ ছুর্ভিক্ষ সাহায্য ভাণ্ডার ১৮৮০ ... ৫০০৲
৫। নয়ানন্দ দাতব্য সাহায্য ভাণ্ডার ১৮৮৯ ... ৫০০৲
৬। তালপদ ছুর্ভিক্ষ .. ১৮৯০ ... ৭০০৲
৭। ভোগরাই সাহায্য ভাণ্ডার ১৮৯০ .. ৫০০৲
৮। ভোগরাই গ্রামে দুঃখী লোকদিগকে বস্ত্র প্রদান ১৮৯০ ৫০০৲
৯। কামার দা সাহায্য ভাণ্ডার ... ১৮৯১ ... ৫০০৲
১০। ভারতবর্ষীয় দাতব্য সাহায্য ভাণ্ডার ... ১৯০০ ... ১০০০৲

বিবিধ।

১। বালেশ্বর মিউনিশিপালিটী হইতে দুইটা অপরিষ্কার বস্তি উঠাইবার ব্যয় ... ... ১৭৯১ ... ২০০০৲
২। বালেশ্বর সহরে পয়ঃপ্রণালী ও আলোকের উন্নতি কল্পে দান, ... ১৮৯০—৯১—৯২ ৫৭৪৲
৩। লণ্ডন নগরে রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভায় এককালীন দান ... ... ১৮৮৮ ... ৫০০৲
৪। কৃষ্ণদাস পালের প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য দান ... ৫০০৲
৫। পান্তর চিকিৎসালয়ে এককালীন দান ... ১০০৲
৬। যাজপুর শিল্প প্রদর্শনীতে এককালীন দান ... ২৫০৲
৭। সহকারী সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার বাবু ছক্কুলাল সরকারের বালক বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ সাহায্য দান ... ২০০৲
(১৮৯৫ সালে ইনি হঠাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হন।)
৮। হীরক জুবিলি ভাণ্ডারের চাঁদা দান ১৮৯৭ ৫০০৲

পুষ্করিণী খনন এবং পঙ্কোদ্ধার।

১। পানি কৈলি পুষ্করিণী কটক ... ৫০০৲
১। পুষ্করিণী মণিপুর ... ৭৮০৲
১। ঐ আনকুরা, বালেশ্বর ব্রাহ্মণ গাঁ ... ১২০৲
১। „ ইন্দ্রম আনকুরা বালেশ্বর ... ৬৪০৲
১। „ অনন্তপুর কাইডা বালেশ্বর ... ৩১০৲

১।	„	আনিরি ঐ ঐ		…	৬০০৲
১।	„	পুরুষোত্তমপুর, ঐ ঐ		…	৩০০৲
১।	„	সাহুর, সোরো		…	২৫০৲
১।	„	ছত্রপুর ঐ		…	৫০০৲
১।	„	মাছাদা ঐ		…	৪৫০৲
১।	„	তুরিগারিয়া ঐ		…	২৫০৲
১।	পুষ্করিণী	গম্ভীবার	সোরো	…	৩০০০৲
১।	„	নায়েক বাঁদ	ঐ	…	৪৫০৲
১।	„	রঘুনাথ সাগর	বালেশ্বর	…	৬০০০৲
১।	„	রাণী সাগর	ঐ	…	৪০০০৲
১।	„	বানাস্তা	সোরো	…	২০০৲
২।	„	গোপালপুর	ঐ	…	৯০০৲
২।	„	প্রয়াপদ	বালেশ্বর	…	৬০০৲
১।	„	সুনহাট	ঐ	…	৬০০৲
১।	„	কামারসাহী	ঐ	…	৫০০৲
১।	„	সুগা	আনকুরা	…	৯০০৲
৫।	„	রাজনগর	বালেশ্বর	…	৩০০০৲
১।	„	সিন্ধিয়া	ঐ	…	৭০০৲
১।	„	গান্ধারপুর		…	৪০০৲
১।	„	গাবগান		…	৫০০৲
১।	„	বীরকুল	…	…	৩০০৲
১।	„	রহিম নগর	…	…	৪০০৲
১।	„	বারপদ	…	…	৩০০৲
১।	„	জেলা স্কুলের মধ্যে		…	২৫০৲
১।	„	বক্সিবাজার, মেদিনীপুর		…	৩০০৲
১।	„	বেলুড়, হাওড়া	…	…	২৮০০৲

কূপ খনন ও পঙ্কোদ্ধার।

কাছারি বাটীর কূপে জল উত্তোলনের জন্য পম্প ১৮৭৭ ৩৫০৲

৪৯ কূপ জেলার চতুর্দ্দিকের ট্রাঙ্ক রাস্তার পার্শ্বে			১৮৭৯	৮০০৲
১। „ „	চাঁদবালী	...	১৮৭৮	৩০০৲
১। „ „	তাদ্রিপাল, কটক	...	...	১০০৲
১। „ „	বারি ঐ	...	...	২০৲
১। „ „	বারপদ	...	...	২০৲
১। „ „	ছত্রপুর	...	...	১৮০৲
৪। „ „	রাজনগর, বালেশ্বর		...	১২০০৲
১। „ „	বারোবাটী ঐ		...	৩০০৲
১। „ „	দামোদরপুর ঐ		...	৩৫০৲

সদাব্রত।

১৮৬৩ সালে সদাব্রত স্থাপন হয় বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ১২০০৲

১৮৭২ সালে একটি মুদ্রা যন্ত্র স্থাপিত হয় বাৎসরিক ব্যয় ১০০০৲

এই রাজবংশের জমিদারী প্রায় ৬২টী অধিকারে বিভক্ত। কটক বালেশ্বর এবং মেদিনীপুরে স্থিত। সমস্ত জমিদারীতে তিন লক্ষ বিঘা ভূমি এবং এক লক্ষের উপর প্রজা আছে।

রাজকীয় চিহ্ন।

ভৃত্যদিগের পরিচ্ছদ সাদা ইজার, বেগুনিয়া চাপকান তাহাতে লাল ডোরা এবং লাল পাগড়ি।

"সতেন বর্ত্ততে ধর্ম্মঃ
যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ"

ধর্ম্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং যথায় ধর্ম্ম তথায় জয়।

জাহানাবাদের অষ্টগ্রামী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্যসূচকউপাধি বালেশ্বরের
রাজা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর	বালেশ্বর	জমিদারী	দে	চাকুলে	শাণ্ডিল্য	কুলিন	সাত বা সারদে
শ্রীরামচরণ দে	গয়েশপুর	„	দে	„	শাণ্ডিল্য	কুলিন	সাত দে
শ্রীশিবচন্দ্র মল্লিক	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	দে	„	শাণ্ডিল্য	কুলিন	বামন দে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মল্লিক	মেদিনীপুর	জমিদারী	রক্ষিত	„	কাশ্যপ	কুলিন	তেলান মল্লিক
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সেন	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	সেন	„	শাণ্ডিল্য	কুলিন	সেবারাজ সেন
শ্রীমহেশচন্দ্র সেন	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	সেন	„	শাণ্ডিল্য	কুলিন	সেনপুরের সেন
শ্রীতিনকড়ি গুঁই	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	গুঁই	„	কাশ্যপ	কুলিন	কুশমাতার গুঁই
শ্রীরমানাথ নন্দী	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	নন্দী	„	„	কুলিন	বাগড়ার নন্দী
শ্রীচিন্তামণি লাহা	ঘাঁটাল	ব্যবসায়	লাহা	„	„	কুলিন	বড়ামের লাহা
শ্রীমহেশচন্দ্র আশ	প্রতাপপুর	চাকরী	আশ	„	„	(মজকুরি)	„
শ্রীশশীলাল কর	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	কর	„	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	„
শ্রীশিবপ্রসাদ কর	কলিকাতা	ব্যবসায়	কর	তেলকুপি	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	তেলকুপি কর
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	দত্ত	„	„	মৌলিক	বামনদে মানিকের পাত্র
শ্রীহারাধন দে	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	দে	দেপুর	„	মৌলিক	দেয়ের দে

শ্রীগোপালচন্দ্র মাল	মেদিনীপুর	চাকরি	মাল	„	„	মৌলিক	„
শ্রীফকিরচন্দ্র সিংহ	চন্দ্রকোনা	ব্যবসায়	সিংহ	„	„	মৌলিক	বামনদে মালিকের পাত্র
শ্রীপ্রসন্নকুমার কুণ্ডু	চন্দ্রকোনা	ব্যবসায়	কুণ্ডু	„	„	মৌলিক	„
শ্রীশশীভূষণ দাস	তমলুক	ঔষধ বিক্রয়	দাস	„	„	মৌলিক	„
শ্রীউমাচরণ নাদ	খানাকুল	ব্যবসায়	নাদ	„	„	মৌলিক	বামনদের পাত্র
শ্রীপ্রিয়নাথ সেন	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	সেন	„	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	„
শ্রীদুর্গাদাস রক্ষিত	মেদিনীপুর	জমিদারী	রক্ষিত	„	কাশ্যপ	মৌলিক	লুপ্তপোলের পাত্র
শ্রীজ্ঞানদাকুমার পাল	খানাকুল	ব্যবসায়	পাল	„	„	মৌলিক	„
শ্রীউমাচরণ লাহা	খানাকুল	বস্ত্র বিক্রয়	লাহা	„	„	মৌলিক	বড়ামের লাহা মালিকের পাত্র।
শ্রীকুঞ্জবিহারী বর্দ্ধন	বালেশ্বর	ব্যবসায়	বর্দ্ধন	„	„	মৌলিক	„
৺ পেলারাম গণ	মেদিনীপুর	„	গণ	„	„	মৌলিক	লুপ্ত
শ্রীবলরাম মল্লিক	কলিকাতা	লৌহ ব্যবসায়	রক্ষিত	„	শাণ্ডিল্য	„	দয়াল রক্ষিত

মেদিনীপুরের চতুর্গ্রামী।

এই সমাজে সেন, কুণ্ডু, গণ, ও দে পদবীধারীগণই কুলীন। চারি খানি গ্রামে বাস নিবন্ধন গ্রামের নামানুসারে ঐ কুলিনগণ আপনাদিগকে সেনপুরের সেন, বিষ্ণুপুরের কুণ্ডু, পাতুল সাঁড়ার গণ ও দে গ্রামের দে বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সকল গ্রামে অনুমান ২০০৲ দুই শত বৎসর ইহাদের বাস। আদি বাস স্থান সম্বন্ধে অষ্টগ্রামীদিগের সহিত ইহাদের অনেক একতা পরিলক্ষিত হয়। ইহারাও বলেন যে, আমাদের আদি বাসস্থান মায়াপুর গ্রামে। মুসলমানদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আমরা মায়াপুর ত্যাগ করিয়াছিলাম। যাহাহউক, কয়েকটী বিষয় ছাড়া অধিকাংশ বিষয়েই অষ্টগ্রামী দিগের সহিত ইহাদের সৌসাদৃশ্য আছে। তবে ক্রিয়াকলাপে দেবতা স্থানে "সন্দেশের কড়ি" ইহারা মেদিনীপুরস্থ জগন্নাথ দেবকে না দিয়া ঐ স্থানের শীতলা দেবীকে দিয়া থাকেন। দূরস্থ গ্রামবাসীগণ তত্রস্থ গ্রাম্য দেবতার নিকট উপরোক্ত "কড়ি" দিয়া থাকেন। অন্যান্য সমাজের তুলনায় এই সম্প্রদায়ে বিদ্বানলোক অল্প। মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীনটবর দত্ত এবং হুগলী জেলাস্থ কামারপুকুর নিবাসী শ্রীশ্রীরামচন্দ্র লাহা—ইহারা উভয়েই অবৈতনিক বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং সমাজ মধ্যে শিক্ষিত ধরিতে গেলে ইহারাই সেই আসনের অধিকারী। বিদ্বান অপেক্ষা এই সমাজে জমিদারের সংখ্যা কিছু পরিমাণে অধিক। জমিদারের মধ্যে দত্ত বংশ ও লাহা বংশই উল্লেখ যোগ্য। চতুর্গ্রামী সমাজের মধ্যে ৺গঙ্গারাম দত্ত এক জন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। ইহার পিতার নাম ৺রাধাকৃষ্ণ দত্ত। আমুয় ভূরসুবা গ্রামে ইহাদের আদিম বাস ছিল। ব্যবসায় উপলক্ষে ইহার পিতা মেদিনীপুরে আসিয়া বসবাস করেন। প্রথমে ইঁহাদের অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। ৺রাধাকৃষ্ণ দত্ত সামান্য মুদিখানার দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। রাধাকৃষ্ণ দত্তের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গঙ্গারাম এবং কনিষ্ঠ রামচাঁদ দত্ত। সামান্য ব্যবসায় হেতু রাধাকৃষ্ণ কিছু ধন সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কাল সহকারে গঙ্গারামের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়ায়, ইনি প্রভূত

ধনের অধিকারী ও সমাজের মধ্যে বিশেষ সম্মানার্হ ও খ্যাতাপন্ন হয়েন। শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত, শ্রীনটবর দত্ত ও শ্রীরামচাঁদ দত্ত ইঁহারা সকলেই এক পরিবারভুক্ত। ইঁহাদের সমবেত জমীদারীর আয় অনুমান ৫২০০৲ টাকা। রামচাঁদ দত্ত এখনও বর্ত্তমান আছেন। ইঁহাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক হীন। ইনি বার্দ্ধক্যতা নিবন্ধন চক্ষে অল্প দেখেন ও তৎসহ শ্রবণ শক্তিরও হ্রাস হইয়াছে। রামচন্দ্র পূর্ব্বে কিছুকাল কমিশারিয়েটে কর্ম্ম করেন। অতঃপর ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া এক্ষণে বাটীতে থাকিয়াই বিষয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কামারপুকুর নিবাসী শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র লাহা ও শ্রীশ্রীরামচন্দ্র লাহা ইঁহারাও উভয়ে জমীদার শ্রেণীভুক্ত। ইঁহাদের জমীদারীর আয় উভয়ের স্বতন্ত্র।

মেদিনীপুরের চতুর্গ্রামী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্য সূচক উপাধি।
শ্রীপীতাম্বর দে	মেদিনীপুর	„	দে	দেপুর	কপিলর্ষি	কুলিন	দেয়ের দে
শ্রীঅভয়চরণ কুণ্ডু	মেদিনীপুর	„	কুণ্ডু	„	সপ্তর্ষি	কুলিন	„
শ্রীহেমচন্দ্র সেন	চন্দ্রকোনা	„	সেন	„	„	কুলিন	„
শ্রীশ্রীনাথ গণ	লাহিরগঞ্জ	„	গণ	„	„	কুলিন	„
শ্রীরামচাঁদ দত্ত	মেদিনীপুর	জমিদারী	দত্ত	বটগ্রাম	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	বটগ্রামী দত্ত
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ লাহা	মেদিনীপুর	„	লাহা	„	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	„
শ্রীনবীনচন্দ্র পিরি	মেদিনীপুর	„	পিরি	„	মধুকোল্য	মৌলিক	„
শ্রীমাহাতাব চন্দ্র নাদ	সিলদা	„	নাদ	„	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	„
শ্রীভূতনাথ সিংহ	খানাকুল	„	সিংহ	„	„	মৌলিক	„
শ্রীআশুতোষ গুঁই	খানাকুল	„	গুঁই	„	কাশ্যপ	মৌলিক	„
শ্রীসত্যচরণ কর	মেদিনীপুর	„	কর	„	মধুকোল্য	মৌলিক	„
শ্রীযজ্ঞেশ্বর নাগ	চন্দ্রকোনা	„	নাগ	„	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	„

হুগলির দক্ষিণদাঁড়া ৪২ গ্রামী।

মহাত্মা গোবর্দ্ধন রক্ষিত।

দক্ষিণদাঁড়া সমাজ সপ্তগ্রাম প্রদেশে গঠিত হইয়াছিল, অতএব কুশদহবাসী সপ্তগ্রামী সমাজের সন্ততিগণের দক্ষিণদাঁড়া ৪২ গ্রামী সমাজকে পিতৃস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্বনামধন্য পুরুষ ৺ গোবর্দ্ধন রক্ষিত এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাম্বূলী কুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। যাত্রা করিবার সময় তাঁহার দেশবাসী গোবর্দ্ধনের নাম করিয়া যাত্রা করিয়া থাকে। তারকেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির গোবর্দ্ধন রক্ষিত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহাতে গোবর্দ্ধনের নাম কেবল মাত্র তাম্বূলী কেন, হিন্দু মাত্রের নিকট প্রসিদ্ধ ও গণনীয় হইয়াছে। কলিকাতার মাড়ওয়ারী বণিকগণ ঐ মন্দিরের পরিবর্ত্তে অধিকতর সৌষ্ঠবশালী দেবায়তন নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। দেবস্ব রক্ষক মোহান্ত মহারাজ তাহার প্রতিবাদ করেন। আমরা গোবর্দ্ধন রক্ষিতের জীবনী তদ্বংশীয় শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রক্ষিতের নিকট যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সন ১০৯৮ সালে বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি কর্জ্জনা গ্রামে তাম্বূলী বংশে গোবর্দ্ধনের জন্ম হয়। গোবর্দ্ধনের পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। গোবর্দ্ধনের জন্মের দুই মাস পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার জননী দীনহীনা কাঙ্গালিনীর ন্যায় অতি কষ্টে আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতিদিগের সাহায্যে কুমারের লালন পালন করেন। ক্রমে অন্নাশনের কাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া অতি সামান্যভাবে অন্নপ্রাশন সমাধা করিলেন। তিনি কাট্‌না কাটিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য যে সাদা গড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ বস্ত্র ও অপরাংশ চাদর করিয়া দিয়াছিলেন। সেই হেতু আমাদিগের বংশে অন্নপ্রাশনকালীন বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে চেলী কিম্বা গরদের জোড় বন্দোবস্ত নাই। পূর্ব্ব প্রথা আমরা অদ্যাপি অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। ক্রমে গোবর্দ্ধনের পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম দেখিয়া তাঁহার জননী বিদ্যাশিক্ষার্থ গ্রাম্য পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন। তিনি বৎ-

সামান্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, জননীর কষ্ট দেখিয়া তিনি লেখা পড়া পরিত্যাগ করতঃ দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কোন এক আত্মীয়ের কারবারে সামান্য বেতনে প্রবিষ্ট হন। গোবর্দ্ধনের এত অল্প বয়সে ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও কার্য্যপটুতা দেখিয়া ধনী তাঁহাকে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাহ্লাদে তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহার বিবাহ দেন। বিবাহের কিছুদিন পরে গোবর্দ্ধন চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, সংসারের ভার ক্রমে গুরু হইতে গুরুতর হইতেছে, সুতরাং চাকরি করিয়া এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করা সুকঠিন। এই সিদ্ধান্তে তিনি চাকরি পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ের আশয়ে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে হুগলীর অন্তঃপাতি সন্ধিপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে কতকগুলি জোলা ও ইতর শ্রেণীর লোকের বাস। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, সামান্য ব্যবসায়ের পক্ষে এই স্থান বিশেষ উপযুক্ত। তাঁহার জীবনের উন্নতির এই প্রথম সোপান। ক্রমে ব্যবসায়ের উন্নতি দেখিয়া জননী ও পত্নীকে কর্জ্জনা হইতে সন্ধিপুর গ্রামে লইয়া আসিলেন। ব্যবসায় সূত্রে গোবর্দ্ধনের সন্ধিপুরে বাস। ক্রমশঃ ঐ ব্যবসায় হইতে উন্নতি করিয়া পরিশেষে রীতিমত দোলোচিনি ও সুপারির ব্যবসায় খুলিয়াছিলেন। সন ১১২৮ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র রামনারায়ণের জন্ম হয়। ক্রমে তাঁহার আরও চারিটী পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম রামনিধি, কালীচরণ, দাতারাম ও ভক্তরাম। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্থানীয় ও বিদেশীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ঐ সময় গোবর্দ্ধন ধর্ম্ম ব্যবসায়ের দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সন্ধিপুর গ্রামে তাঁহার প্রসিদ্ধ অতিথিশালা ছিল। অনাথ আশ্রম কার্য্যক্ষম সুযোগ্য কর্ম্মচারী দ্বারা সুচারুরূপে পরিচালিত হইত। অতঃপর একদিন দৈবঘটনায় তাঁহার সন্ধিপুর গ্রামের দোকানাদি ও বাসস্থান অগ্নি লাগিয়া ভস্মসাৎ হয়; কেবল মাত্র একখানি সুপারির গোলা অবশিষ্ট থাকে। ঘটনার দিবস গোবর্দ্ধন ঘরগইল গ্রামের কারখানা হইতে সন্ধিপুরে প্রত্যাগমন কালীন পথিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ঐ ব্রাহ্মণ গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া পূর্ব্ব পরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ করিলেন, এবং কহিলেন, অদ্য তোমার বাটীতে বিশেষ পরিতোষের সহিত আহার করিয়াছি—কিন্তু মুখশুদ্ধি হয় নাই। এইরূপ কথোপকথনের পর ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। গোবর্দ্ধন এই বিষয়

ভাবিতে ভাবিতে গ্রামের প্রান্ত সীমায় আসিয়া শুনিলেন, অগ্নিদাহে গৃহ বাটী এবং দোকান পাট প্রভৃতি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি হায় কি করিলাম, চিনিতে পারিলাম না বলিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুপারির গোলা ব্যতীত সমস্তই সর্ব্বভুকের উদরসাৎ হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ পুরোহিত ডাকাইয়া যথাশাস্ত্র সুপারির গোলা অগ্নিদেবকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। অগ্নিদাহে তাঁহার ব্যবসার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই বরং বিপুল অর্থ উপার্জ্জিত হইয়াছিল। গোবর্দ্ধন কালীভক্ত ছিলেন। শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী কাপড়পুর বাগাওা নামক গ্রামে কালীপূজার দিন উপস্থিত হইয়া ষোড়শোপচারে পূজা ও দানাদি করিয়া আসিতেন। কথিত আছে যে, উক্ত কালিকাদেবী গোবর্দ্ধনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া একদিন স্বপ্নে তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করেন যে, আমার মন্দিরের পার্শ্ব হইতে মৃত্তিকা লইয়া দেবী মূর্ত্তি গড়িয়া প্রতিষ্ঠা করিলে আমি তাহাতে আবির্ভূত হইব। গোবর্দ্ধন দেবীর আদেশমত মূর্ত্তি গঠন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি শিব ও বিষ্ণু স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই সকল দেবদেবীর দৈনিক সেবা ও অতিথিশালার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। গোবর্দ্ধন ধর্ম্মপরায়ণ, উদারচেতা ও সত্য প্রতিজ্ঞ ছিলেন। লোক মুখে শুনা যায় যে, এখন যথায় তারকেশ্বরের মন্দির বিরাজিত, ঐ স্থান টাউড়কাঁটার জঙ্গলে পূর্ণ ছিল ও রামনগর গ্রামের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ঐ গ্রামে মুকুন্দ ঘোষ নামক জনৈক গোপ বাস করিত। সে দধি দুগ্ধ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহার ভৃত্যেরা মাঠে গরু চরাইতে লইয়া যাইত। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় একটি দুগ্ধবতী গাভি ঐ টাউড়কাঁটার বনে প্রবেশ করিয়া তারকনাথ দেবের মস্তকে দুগ্ধ বর্ষণ করিত। মুকুন্দ ঘোষ গাভির দুগ্ধ না দিবার কারণ অনুসন্ধানে অক্ষম হইয়া রাখাল বালকগণকে তিরস্কার করিত। মুকুন্দের তাড়নায় রাখাল বালকগণ প্রপীড়িত হইয়া কে দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রাখালগণ কতিপয় দুগ্ধবতী গাভির অনুসরণ করিয়া দেখিল যে, টাউড়কাঁটার বনমধ্যস্থ প্রস্তর খণ্ডের উপর এক এক করিয়া দুগ্ধ বর্ষণ করিতেছে। এই সংবাদ রাখালেরা মুকুন্দ ঘোষকে জ্ঞাপন করিল এবং প্রত্যক্ষ দর্শন করাইল। মুকুন্দরাম ঐ প্রস্তর খণ্ডকে দেবতা

ভাবিয়া সেই স্থান পরিষ্কার করতঃ ক্ষমতা মত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে তারকনাথ দেব গোবর্দ্ধনকে প্রত্যাদেশ করেন যে, এই স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ ও দুইটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দাও। গোবর্দ্ধন আদেশমত সত্বর উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, গোবর্দ্ধন কলিকাতার কোন এক মহাজনকে এক শত বস্তা চিনি নমুনা দৃষ্টে ধার্য্য দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ মহাজন নমুনামত চিনি নয় বলিয়া গোলযোগ উপস্থিত করেন। উদ্দেশ্য ছিল, দরে বাট্টা করিবে; গোবর্দ্ধন তাহাতে অস্বীকার করিয়া ঐ বস্তা গুলি অন্যকেও বিক্রয় না করিয়া গঙ্গায় ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ইনি নানা স্থান হইতে স্বজাতি কুটুম্বকে আনাইয়া নিজ অর্থে তাহাদিগের বসবাস নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম স্থাপনাও করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের ন্যায় তিনি বেশ ভূষা ও আবাসবাটীর চাকচিক্যে লক্ষ্য রাখিতেন না। তাঁহার পরিধেয় বসন পাঁচি ধুতির বন্দোবস্ত ছিল। তিনি দীন দরিদ্র লোকদিগকে অর্থ দান করিতেন। কোন ভদ্র লোকের অবস্থান্তরিত দেখিলে ছলে কৌশলে যে কোন প্রকারে হউক, অর্থ দানে তাঁহার অভাব মোচন করিতেন। তিনি এইরূপ ব্রতে ব্রতী থাকিয়া ক্রমে হুগলী ও বর্দ্ধমান বিভাগে সাধারণ লোকের জলকষ্ট নিবারণের জন্য দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন দ্বারা সাধারণের সমূহ উপকার করিয়াছিলেন। নিজের স্বার্থ বা নামের দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া ঐ সকল দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন এবং তাঁহাদের নামেই উৎসর্গ করিতেন।

বর্ত্তমান তারকেশ্বর ব্রাঞ্চ ষ্টেশনের নিকট গোবিন্দপুর গ্রামের প্রান্ত সীমায় ঐ সময় গোবর্দ্ধন একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এবং সেই কারণ কয়েক দিন তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তাঁহার তথায় অবস্থানকালে কি ভদ্র, কি ছোট, সর্ব্বশ্রেণীর লোক সকল সমবেত হইয়া গোবর্দ্ধনের নিকট উপস্থিত হয় এবং বরিষাকালে ডানকুনির মাঠ অতিক্রম করিয়া বৈদ্যবাটী পৌছনার কষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছিল। ইহা অবগত হইয়া গোবর্দ্ধন উক্ত পুষ্করিণীর নিকট হইতে মল্লা সীমলা গ্রাম পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি ঐ পথের নাম রক্ষিতের জাঙ্গাল বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। গোবর্দ্ধনের এইরূপ কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া কতকগুলি

দুষ্ট লোক ষড়যন্ত্র করিয়া বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। তিনি ঐ সকল কার্য্য সাধারণের ভাবিয়া রাজাকে না জানাইয়া বিনা সনন্দে অবাধে করিয়া আসিতেছিলেন, দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্র কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। ঐ সময় তারকেশ্বরের সন্নিকট মোড়া নামক স্থানে একটি জলাশয় খনন করান। এই জলাশয় এরূপ স্থানে হইয়াছিল যে, এই গ্রামের ও অন্যান্য গ্রামের লোক সমূহের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

বারম্বার এইরূপ অভিযোগ হওয়ায়, বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুর গোবর্দ্ধনকে অত্যাচারী ও রাজদ্রোহী বিবেচনা করিয়া কতকগুলি শাস্ত্রি ও তৎসঙ্গে একটি উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী সন্ধিপুর গ্রামে পাঠাইয়া দেন। যৎকালে মহারাজপ্রেরিত আমলাগণ সন্ধিপুর পৌঁছিয়াছিলেন, সেই সময় গোবর্দ্ধন বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না। ঘরগোয়াল গ্রামে আপনার চিনির কারখানায় ছিলেন। রাজকর্ম্মচারী গোবর্দ্ধনকে না পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। গোবর্দ্ধন এই সমাচার পাইবামাত্র বার হাজার টাকা সঙ্গে লইয়া রাজ কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মহারাজ রামনারায়ণের জবানবন্দি লইতে ছিলেন। গোবর্দ্ধনের কাতর আবেদনে মহারাজ ঐ কার্য্য স্থগিত রাখিয়া তাঁহার বাচনিক দরখাস্ত শুনিতে প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? কি জন্য বিনা এত্তেলায় ও সনন্দে যথা তথা পুষ্করিণী খনন ও রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া আমার ক্ষতি কর? এ ক্ষতির উদ্দেশ্য কি? তুমি কি জান না যে, এই রূপ ক্ষতিকারী লোক রাজদ্রোহী বলিয়া গণ্য? ইহা শুনিয়া গোবর্দ্ধন বলিলেন, আমার নাম গোবর্দ্ধন রক্ষিত। আমি রাজসংসারের কোনই ক্ষতি করি নাই। বরং রাজকোষের ব্যয় বাহুল্য হ্রাস করিয়াছি। আমি সাধারণের উপকারার্থ ও মহারাজের সুনামের জন্য যথা তথা পুষ্করিণী ও পথাদি প্রস্তুত করাইয়া থাকি। যে স্থানে মহারাজার প্রজাবৃন্দ জলকষ্টে প্রপীড়িত ও জলের জন্য কুলনারীরা গ্রামান্তরে যাইয়া জীবনানয়নে জীবন রক্ষা করে, আমি তাহাদের অভাবমোচনে সেই সেই স্থানে পুষ্করিণী খনন করাই। এ কার্য্য রাজকীয় ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। রাজার কার্য্য প্রজার কষ্ট নিবা-

রণ। আর বস্তুতঃ এ কার্য্যে আমার অথবা আমার বংশাবলির কোনই স্বার্থ নাই। সাধারণের যেখানে জলকষ্ট, সেইখানেই পুষ্করিণী খনন করাইয়াছি ও বেদবিধি মতে ঐ সকল জলাশয় প্রতিষ্ঠা করাইয়া কোন স্থলে ব্রাহ্মণদিগকে দান, অভাবে মহারাজার নামে উৎসর্গ করিয়াছি। বর্দ্ধমানাধিপতি গোবর্দ্ধনের এই সকল উত্তর শুনিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, তুমি বিনা এত্তেলায় রাজধর্ম্মের বিগর্হিত কার্য্য করণ অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হওয়ায়, তোমাকে ১০০১৲ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করা গেল। গোবর্দ্ধন মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বাহকদিগকে রাজসমীপে সমস্ত টাকা আনয়ন জন্য আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র বাহকেরা সমস্ত টাকা লইয়া উপস্থিত করিল। মহারাজ অধিক টাকা দেখিয়া গোবর্দ্ধনকে বলিলেন, তুমি বিচারে যাহা দণ্ডিত হইয়াছ, তাহাই প্রদান কর। গোবর্দ্ধন ইহা শুনিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, বাটী হইতে আসিবারকালে মহারাজার নামে এই সকল টাকা আনিয়াছি, সুতরাং এই টাকার আমার আর অধিকার নাই। মহারাজ বলিলেন, দণ্ডিত টাকার অধিক গ্রহণ করিলে আমার দান গ্রহণ করা হয়, সুতরাং দণ্ডিত অর্থের অধিক আমি লইতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু গোবর্দ্ধনের একাগ্রতা ও বিনয় দর্শনে মহারাজ অবশেষে ঐ সমস্ত টাকা অর্থাৎ ১২০০ দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। এবং কহিলেন, তোমার অসীম রাজভক্তি দেখিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদানে প্রস্তুত আছি। এই কথা শুনিয়া গোবর্দ্ধন সাতিশয় প্রীত হইয়া মহারাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, বিনা সনন্দে অর্থাৎ অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে মহারাজার অধীনস্থ যথা তথা সাধারণের ব্যবহারের জন্য যেন পুষ্করিণী খনন ও পথাদি প্রস্তুত করাইতে পারি। মহারাজা তাহাই স্বীকার করিয়া বলিলেন, ইহাতে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম ন। তোমার নিজের ও অন্যের ব্যবহারের জন্য আর কিছু প্রার্থনা কর। তাহাতে গোবর্দ্ধন গোচারণের জন্য কিছু জমী প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ অতি আগ্রহের সহিত এক বন্দে গোবর্দ্ধনকে ৪০০ বিঘা জমী প্রদান করিলেন। অদ্যাপি ঐ জমী গোবর্দ্ধনের বসত বাটীর পশ্চিম মাঠে বর্ত্তমান আছে। মহারাজ গোবর্দ্ধনের এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাব

দেখিয়া তাঁহার বিনা প্রার্থনায় আরও কিছু জমী দিয়াছিলেন। তিনি মনের আনন্দে বৰ্দ্ধমান হইতে সপুত্রে দেশাগমন করিলেন। এবং রাজার আদেশ মত ঐ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হওবার পর, এক দিন তিনি পুত্রগণকে নিকটে ডাকাইয়া কহিলেন, আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না—তোমরা সকলে আমার নিকট হইতে কিছুদিন স্থানান্তরে যাইও না। পিতার এই কথা শুনিয়া পুত্রগণ তাঁহার সন্নিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এক দিবস প্রাতঃকালে গোবৰ্দ্ধন পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, অদ্য আমাকে কালিকা দেবীর মন্দিরসমীপে লইয়া চল। পুত্রগণ আদেশ মত কাৰ্য্য করিলেন। বেলা আড়াই প্রহরের সময় আসন্নকাল নিকট দেখিয়া গোবৰ্দ্ধন পুত্রগণকে বলিলেন, অদ্য আমার মৃত্যু হইবে। মৃতদেহ বড় পুষ্করিণীর ঈশান কোণে দাহ করিবে। এই কথা বলিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে সন ১১৮৭ সালে কালিকা দেবীর সম্মুখে মহাত্মা গোবৰ্দ্ধন মানবলীলা সংবরণ করেন। কথিত আছে, দাহাদি কার্য্য শেষ হইলে অকস্মাৎ বড় পুষ্করিণীর জল স্ফীত হইয়া দাহ স্থান প্লাবিত করিয়াছিল।

বৰ্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামীর সহিত হুগলীর দক্ষিণদাঁড়া ৪২ গ্রামীর তুলনা করিলে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধে ধরিতে গেলে কেবল আদি ৪২ গ্রামী কেন, অপরাপর যে কয়েকটী সম্প্রদায় আছে,তন্মধ্যে ১৪ গ্রামী ব্যতীত এই সম্প্রদায়ই উচ্চাসন লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর অসদ্ভাব নাই। অপরাপর সমাজে বিএ, বিএল, পৰ্য্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে এ, মে, পৰ্য্যন্ত আছেন। ইহার নাম শ্রীবিপিনবিহারী দে, নিবাস ভদ্রকালী। এক্ষণে ইনি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী আছেন। কলিকাতাস্থ শ্রীচুনীলাল দত্ত, ভদ্রকালী নিবাসী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে এবং টালা নিবাসী শ্রীবামাচরণ রক্ষিত অকৃতকার্য্য হইয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দের বিশেষ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্য-সেবী মাত্রেই ইহার নাম অবগত আছেন। দৃঢ় অধ্যবসায় ও অসীম বিদ্যানুরাগের

জন্য ইনি "কাব্যরত্ন" ও "উদ্ভট সাগর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইনি দুষ্প্রাপ্য উদ্ভট কবিতা ও দেবদেবীর লুপ্তপ্রায় স্তব সংগ্রহে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচুনীলাল দত্ত চাকুরিতে নিযুক্ত আছেন। শ্রীরামযাদু রক্ষিত, শ্রীসাধনচন্দ্র, শ্রীযতীন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীভুবনমোহন দে, শ্রীকুঞ্জবিহারী, শ্রীভোলা-নাথ দে, শ্রীশীতলচন্দ্র দে, শ্রীযোগীন্দ্র লাহা, শ্রীঅনিলচন্দ্র নন্দী, শ্রীনলিনী-কান্ত লাহা ও শ্রীবিপিনবিহারী লাহা—ইঁহাদের মধ্যে তিন জন মাত্র এফ, এ, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েন। এই সমাজে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা চতুর্দ্দশ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীবিনোদবিহারী নাগ ও শ্রীকেদারনাথ দে—এই তিন জন বৃত্তিভোগী। অবশিষ্ট একাদশ জনের নাম নিম্নে লিখিত হইল। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীচুনীলাল রক্ষিত, শ্রীহরিশচন্দ্র সেন, শ্রীনৃত্যহরি দে, শ্রীক্ষেত্রমোহন দে, শ্রীহেমচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীগিরীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীবিনোদবিহারী নন্দী, শ্রীরজনীকান্ত নন্দী, শ্রীঅনিলচন্দ্র সেন ও শ্রীগোপাল চন্দ্র পিরি। ইঁহাদের অবলম্বন সকলের সমান নহে। কেহ কেহ ব্যবসায়, কেহ কেহ চাকরি ও কতকগুলির এখনও পাঠ্যাবস্থা। এই সমাজে জমীদারের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। তন্মধ্যে সন্ধিপুর নিবাসী শ্রীরামযাদু রক্ষিত ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রক্ষিত, যাদববাটী নিবাসী শ্রীঅনিলচন্দ্র সেন, বোড়াইপুর নিবাসী শ্রীক্ষীরদাপ্রসাদ নন্দী, পারভুযুট নিবাসী শ্রীহৃদয়নাথ সেন, পাঁতালে নিবাসী শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, জয়ন্তী নিবাসী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লাহা ও গোপালপুর নিবাসী শ্রীহরিচরণ পাল। ইঁহারাই এক্ষণে জীবিত ও উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি। শ্রীরামযাদু ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রক্ষিত ইঁহারা দুইজনেই সন্ধিপুর নিবাসী স্বর্গীয় গোবর্দ্ধন রক্ষিতের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা যে কেবল জমীদার বলিয়া খ্যাত তাহা নহে, ব্যবসায়ী মধ্যেও ইঁহাদের সুনাম আছে। শ্রীরামযাদু রক্ষিত এক জন খ্যাতনামা বস্ত্রব্যবসায়ী। ধনে, কৌলিন্যে, শিক্ষা ও সমাজে সর্ব্বাগ্রেই ইঁহাদের আসন। ধর্ম্ম প্রসঙ্গেও ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ। সন্ধিপুর হরিসভা তাহার দৃষ্টান্ত। সাহিত্য-সেবীর মধ্যেও ইনি আসন পাইতে পারেন। ইঁহার প্রণীত "ধর্ম্ম সুহৃৎ" তাহার সাক্ষ্য।

হুগলির দক্ষিণদাঁড়া ৪২ গ্রামী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্য সূচক উপাধি।
শ্রীরামবাহু রক্ষিত	সন্ধিপুর	জমীদারী ও ব্যবসায়	রক্ষিত	„	দধিচি	মৌলিক	রম্ভাবতী রক্ষিত
শ্রীহেমচন্দ্র রক্ষিত	কাশীপুর	„	রক্ষিত	„	কাশ্যপ	কুলিন	দম্পাল রক্ষিত
শ্রীগোপাল চন্দ্র চেল	সন্ধিপুর	„	চেল	„	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	„
শ্রীকেদারনাথ আশ	বাগুড়ি	„	আশ	„	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	„
শ্রীঅধরচন্দ্র সেন	সন্ধিপুর	„	সেন	কর্ণপুর	শাণ্ডিল্য	কুলিন	কর্ণসেনী সেন
শ্রীলোকনাথ সেন	কুস্তিরমোড়া	„	সেন	মধুগ্রাম	কাশ্যপ	মৌলিক	মধুগ্রামী সেন
শ্রীরাজারাম পিরি	সন্ধিপুর	„	পিরি	„	কাশ্যপ	মৌলিক	„
শ্রী হরিচরণ লাহা	সন্ধিপুর	„	লাহা	„	শাণ্ডিল্য	কুলিন	বলসিংহ লাহা
শ্রীঠাকুরদাস দাস	সন্ধিপুর	„	দাস	„	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	„
শ্রীচন্দ্রকান্ত নন্দী	পাতুল	„	নন্দী	„	ব্রহ্মঋষি	মৌলিক	„
শ্রী দীননাথ সোম	যাদববাটী	„	সোঁ	„	কাশ্যপ	মৌলিক	সোমশব্দের রূপান্তর
শ্রী চন্দ্রনাথ গুঁই	সন্ধিপুর	„	গুঁই	„	কাশ্যপ	মৌলিক	„
শ্রীশীতলচন্দ্র দাঁ	সন্ধিপুর	„	দাঁ	„	মধুকৌল্য	কুলিন	„
শ্রীখেলারাম কর	সন্ধিপুর	„	কর	„	মধুকৌল্য	মৌলিক	„

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কোঁচ	সাগঞ্জ	„	কচ	„	মধুকোল্যা	মৌলিক	কচশব্দের রূপান্তর
শ্রীকিশোরলাল কুণ্ডু	মৃজানগর	„	কুণ্ডু	„	সপ্তর্ষি	মৌলিক	„
শ্রীনবকুমার পাল	ফতেপুর	„	পাল	„	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	„
শ্রীবিপিনবিহারী দে, এম্, এ, ভদ্রকালী	শিক্ষকতা	দে	দেপুর	কপিলঋষি	কুলিন	দেয়ের দে	
শ্রীবিনোদবিহারী নাগ	জানবাজার	„	নাগ	„	সপ্তর্ষি	মৌলিক	„
শ্রীহরিচরণ দত্ত	সন্ধিপুর	„	দত্ত	গজস্কন্ধ	ব্যাসঋষি	কুলিন	গজস্কন্ধ দত্ত
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত	ঝিকরা	„	দত্ত	বটগ্রাম	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	বটগ্রামী দত্ত
শ্রীমহেশচন্দ্র খাগ	বাগুড়ি	„	খাগ	„	কাশ্যপ	মৌলিক	গ ও ক উচ্চারণের ভেদ মাত্র।
শ্রীশ্রীনাথ সরকার	যাদববাটী	„	„	„	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	আশ্রম লিখিতে পারা গেল না।
শ্রীশ্যামাচরণ সায়	নিলারপুর	„	সায়	„	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	য় ও র উচ্চারণ ভেদ মাত্র।
শ্রীকেদারনাথ দে	ঝিকরা	„	দে	চাকুলে	কাশ্যপ	মৌলিক	চোকালের দে

কুশদহের সপ্তগ্রামী।

হুগলীর দক্ষিণদাঁড়া ৪২ গ্রামীর বাস যখন সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে, তখন উপরোক্ত সম্প্রদায় হইতেই সপ্তগ্রামী সমাজ উদ্ভূত হইয়াছে বলিতে হইবে।

সপ্তগ্রাম হইতে এই সমাজের নামকরণ, সুতরাং সপ্তগ্রামের ইতিহাস এস্থলে লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সপ্তগ্রামের চলিত নাম সাত গাঁ। বস্তুতঃ সপ্তগ্রাম যে সাত খানি গ্রামের সমষ্টি, তাহা নহে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান মহা সমৃদ্ধিশালী ছিল। বঙ্গদেশের রাজধানী ও সুবৃহৎ বন্দর বিধায় ইউরোপ, ইরান, চীন, তুরান, আরব ও পারস্যের বণিকগণ বাণিজ্যার্থ এস্থানে যাতায়াত করিতেন। বর্ত্তমান হুগলী হইতে সপ্তগ্রাম বন্দর অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। পূর্ব্বে এস্থানে এক দুর্গ ছিল। ভাগীরথী যতদিন সপ্তগ্রামকে বক্ষে রাখিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য-পোত সপ্তগ্রামে গতায়াত করিত। অনুমান ১৫৬৬ সাল পর্য্যন্ত এই স্থানে সমভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল। পরে তত্রস্থ সরস্বতী নদী শুষ্কপ্রায় হওয়ায় ও ভাগিরথীর স্রোত শ্রীরামপুরের পূর্ব্বদিক দিয়া গমন করায়, বঙ্গের এই প্রাচীন রাজধানী নষ্ট হয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে হুগলীর উন্নতি হইতে থাকে। এখানকার শাসনকর্ত্তা বঙ্গেশ্বর জাফর খাঁর অসম্মান করায়, জাফর খাঁ সম্রাটের নিকট হইতে এ স্থানের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। যাহা হউক, জাফর খাঁ অতি বিচক্ষণতার সহিত এই স্থান শাসন করেন ও তাঁহার সময়ে এই স্থানের সমূহ উন্নতি হয়। মোগলেরা বিদেশীয়দিগকে এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে দিতেন না, তবে বাণিজ্যাগার স্থাপনের বিরোধী ছিলেন না। এক দিন যেখান দিয়া সুবৃহৎ অর্ণবযান সকল গতায়াত করিত, আজ তদুপরি বাষ্পীয় শকট গমনাগমন করিতেছে। রেলওয়ে কোং তজ্জন্য ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে এক সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই নগরের শাসনকর্ত্তা অত্যাচার আরম্ভ করায়, প্রজাবৃন্দ পলাইয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লয়। তদবধি কলিকাতার উন্নতি হইতে থাকে। পলায়িত-দিগের মধ্যে বাণিজ্য নিরত তাম্বূলীগণ কুশদহের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তাঁহারা যথায় বাসস্থান সন্নিবেশিত করেন, অপর দুই কারণে রাঢ় হইতে অনেকগুলি পরিবারকে স্থানান্তরিত হইয়া কুটুম্বদিগের সহিত নব প্রতিষ্ঠিত পল্লীতে মিলিত হইতে হইয়াছিল। সপ্তগ্রামের শাসন কর্ত্তার অত্যাচার স্থানীয় মাত্র ছিল। কিন্তু স্থান ত্যাগের অপর কারণ পশ্চিম বাঙ্গালার সর্ব্বত্রে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামা ও তদপেক্ষা ভীষণ রাজস্ব আদায়ের উৎপীড়নে সকল জাতীয় লোককে বাসস্থান পরিত্যাগ করাইতে বাধ্য করিয়াছিল। আমরা তৎকালের বঙ্গের অবস্থা গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বের উপক্রমণিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"১৭৪১ অব্দে প্রতাপশালী আলিবর্দ্দীর রাজ্যকাল। উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা মিরজা বাথর ও তাহার মন্ত্রী মীরহবীব পদচ্যুত ও পরাজিত হইলেন। কিন্তু পদচ্যুত মিরজাবাথর পুনরায় উড়িষ্যা হস্তগত করিয়া পুনরায় পরাজিত ও দূরীভূত হইলেন। বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা শান্ত হইল। আলিবর্দ্দীও উড়িষ্যা হইতে রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই ঘোর উপদ্রব। জল প্লাবনের জলের ন্যায় যেন সৃষ্টিনাশ মানসে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য নৃত্য করিতে করিতে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল। নবাব মেদিনীপুরে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে উড়িষ্যার প্রত্যাগত সৈন্যও ছিল। কিন্তু সে সৈন্য সমুদ্রবেগের মুখে তৃণের তুল্য। বর্দ্ধমান রক্ষা করিবার জন্য আলিবর্দ্দী দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গিয়া দেখেন বর্দ্ধমান দগ্ধ হইতেছে। সন্ধিতে হতাশ হইয়া তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখেন, তাঁহার অশ্ব, শকট, আহারীয় দ্রব্য ও তাম্বূ আদি কিছুই নাই। সমস্তই মহারাষ্ট্রীয়েরা আত্মসাৎ করিয়াছে। তখন তিনি যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইলেন, তাঁহার সৈন্যগণের উপর বিশ্বাসঘাতকতার শঙ্কা হইল। তিনি নিশাকালে সিরাজের সহিত প্রধান সেনাপতি মস্তফার শিবিরে গিয়া কহিলেন, মস্তফা! আমাদের প্রাণবধ কর। মস্তফা লজ্জিত হইয়া নবাবের সহিত কাটোয়া রক্ষার জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাৎগামী হইলেন। কিন্তু গিয়া দেখেন, কাটোয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। মুরশিদাবাদ রক্ষার জন্য যত্ন। কিন্তু দেখেন, তাহাও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সখা মীরহবীব লুণ্ঠন করিয়াছে। বীরভূমের জন্য প্রয়াস, তাহাও মহারাষ্ট্রীয়েরা বিনষ্ট করিয়াছে।

তখন পরিশ্রান্ত ও পরাভূত নবাব হতাশ হইয়া পরিবার সহ গঙ্গাপার হইয়া বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগ আশ্রয় করিলেন। ভাগিরথীর দক্ষিণ পার্শ্ব শূন্যময় হইল। সম্রাট এই সময়ে রাজস্বের নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন। আলিবর্দ্দী কর্ণপাত না করিয়া বিপুল সৈন্য সহকারে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে দূরীভূত করিলেন। কিন্তু রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, মুরশিদাবাদের নিকট অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যসহ ভাস্করের প্রভূ রঘুজী চতুর্দ্দিক লুণ্ঠন করিতেছেন। তাহার পশ্চাতে সম্রাট প্রেরিত বালাজী বাঙ্গালা রক্ষার ব্যাজে অপর এক দল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যসহ লুণ্ঠন করিতে উদ্যত। নবাব বালাজীকে ভূরি অর্থ দিয়া লুণ্ঠন হইতে নিবৃত্ত করিলেন। বালাজী সেই অর্থ ও রঘুজীর লুণ্ঠিত অর্থ পুনর্লুণ্ঠন করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুজীর বাঙ্গালা পরিত্যাগের পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার ভাস্কর আসিয়া উপস্থিত। আলিবর্দ্দী বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক কাটোয়ার নিকট গোবড়ার চড়ে ভাস্করের প্রাণবধ করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই মুস্তফার বিদ্রোহ। মুস্তফা রঘুজীকে আহ্বান করিলেন। আহ্বান মাত্রেই বাঙ্গালার চতুর্দ্দিকে অগ্নি ক্ষেত্র। গ্রাম দগ্ধ, ক্ষেত্র দগ্ধ ও উদ্যান দগ্ধ হইতে লাগিল। রঘুজী কাটোয়ায় পরাজিত ও মুস্তফা বিহারে হত হইল। পরক্ষণেই সমসেরের বিদ্রোহ ও মীর হবীবের সহ মহারাষ্ট্রীয়দের বাঙ্গালায় পুনঃ প্রবেশ। বিদ্রোহীরা দমন হইল। নবাব মহারাষ্ট্রীয়দের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। তাহারা অপসৃত হইল, কিন্তু এদিকে সিরাজউদ্দোলা বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দের পুনর্ব্বার বাঙ্গালা প্রবেশের উপায় হইল। নবাব ক্লান্ত হইয়া কি মহারাষ্ট্রীয়, কি মীরহবীব যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাকে তাহাই দিয়া ক্ষান্ত করিলেন। মীরহবীব উড়িষ্যার নবাব হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দের জন্য বার্ষিক দ্বাদশ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দীও পরলোক গমন করিলেন। তৎপরে দুরন্ত সিরাজউদ্দোলার অত্যাচার আরম্ভ হইল। সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই সিরাজ আপন পিতৃব্য পত্নীর যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ ও সকতজঙ্গকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। এমন পাপই নাই, যাহা এই নরাধম দ্বারা কৃত হয় নাই। এই পাপাত্মার পরই যবন রাজ্য নিঃশেষিত হয়। যবনদিগের শেষ সময়ে প্রজাগণের কতই না ক্লেশ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দের শব্দ পাইবা-

মাত্র অতি মাত্র ব্যাকুল হইয়া কেবল দেব বিগ্রহ ও স্ত্রী পুত্রাদি সহ হাহাকার শব্দে সকলে গঙ্গাপারে পলায়ন করিত। পোতবাহীরা মহারাষ্ট্রীদের গঙ্গাপার বন্ধ করিবার জন্য পোত সকল তৎক্ষণাৎ অপরপারে লইয়া যাইত। গঙ্গাপার তখন অরণ্যময় ছিল। নিশাকালে স্ত্রী পুত্র বালক সহ চিন্তায় আকুল হইয়া কত লোক অরণ্যে বিচরণ করিত। ঈদৃশ দুরবস্থাতে ও সর্প দংশনে কাহারও বা স্ত্রীবিয়োগ হইত। কুম্ভীর গ্রাসে কাহারও বা সন্তান নাশ হইত। ব্যাঘ্রের মুখে কাহারও বা প্রাণ বিনষ্ট হইত। কি দুঃখেই পূর্ব্বকাল গত হইয়াছে! যবনদের রাজ্যাপেক্ষা সর্পের বিল, কুম্ভীরের গ্রাস ও ব্যাঘ্রের আবাস নিরাপদ ছিল। তজ্জন্যই তাহারা তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। মাতৃভূমির কি মহা-মায়া! মহারাষ্ট্রীয়েরা বাস্তু বৃক্ষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিলেও সকলে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিতেন। পরদিনেই ভূম্যধিকারিগণের ভয়ানক করের পীড়ন সহ্য করিতে হইত। লুণ্ঠন করাই তৎকালে কর সংগ্রহ করিবার পদ্ধতি ছিল। ভূম্যাধিকারিগণ কর সংগ্রহ করিয়া নবাবকে প্রেরণ করিতেন না। কিন্তু প্রেরণের সময় গত হইলে নবাব সৈন্য পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে পুনর্ব্বার প্রজার নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন। নবাবও আবার সকল সময় দিল্লীতে কর প্রেরণ করিতেন না। কিন্তু সম্রাটের লোক আসিবার পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয়েরা রীতিমত সময়ে বর্ষে বর্ষে সগণে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। মহারাষ্ট্রীয়-দের অত্যাচার অপেক্ষা রাজস্ব সংগ্রহের অত্যাচার অধিক ভয়ঙ্কর ছিল। এতকাল গত হইয়াছে, তথাপিও মাতৃগণ প্রায় ভূমিষ্ঠ মাত্রেই শিশুদিগকে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের যন্ত্রণা ও রাজস্বের চিন্তা এখনও শ্রবণ করাইয়া থাকেন।"

"ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে?"

এই সমাজের পারিবারিক বৃত্তান্ত কুশদ্বীপকাহিনীতে বিস্তৃত রূপে বিবৃত হইয়াছে সুতরাং এই স্থলে আর অধিক বর্ণনায় আবশ্যক নাই।

কুশদ্বীপকাহিনী প্রণেতা ৺ বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী তাম্বূলীর ইতিবৃত্ত

যাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, সেই অংশ উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

কথিত আছে, খাঁটুরার বর্ত্তমান তাম্বূলিগণ খাঁটুরার আদিম নিবাসী নহেন। উহাঁরা পূর্ব্বে ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে সপ্তগ্রামে বাস করিতেন। বর্ত্তমান হুগলী সহরের অতি নিকটেই সপ্তগ্রাম অবস্থিত। তদানীন্তন কালে সপ্তগ্রামের তুল্য বন্দরস্থান বাঙ্গালা দেশে আর দ্বিতীয় ছিল না। বহুকালাবধি ঐ বন্দর সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী থাকিয়া খ্রীষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীতে ধ্বংসাবস্থায় পতিত হয়। অনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীর মধ্যভাগে যখন জাফের খাঁ বঙ্গদেশের নবাবপদে অধিরূঢ় থাকেন, তৎকালে অত্যাচারপীড়িত হইয়া বিস্তর লোক এখান হইতে নানা দিক্‌দেশে গিয়া বসবাস করেন। সেই সময়ে সপ্তগ্রামবাসী ৪২ বেয়াল্লিশ গ্রামী তাম্বূলিগণ কুশদহের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বনগ্রামে; কেহ কেহ শান্তিপুরে, কেহ কেহ বড়া কড়েলা প্রভৃতি স্থানে, কেহ কেহ বাঁকড়ায়, কেহ কেহ মল্লিকপুরে, এবং কেহ কেহ বেড়েলা বৈঁচি প্রভৃতি গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

খাঁটুরা গ্রামে আজকাল একত্রে যে অধিকাংশ তাম্বুলির বসবাস দেখা যায়, তাহা ইছাপুর গ্রামের জমীদার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী মহাশয়ের প্রসাদাৎ। তিনি আনুমানিক ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাম্বুলিগণকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে আনাইয়া খাঁটুরাগ্রামে বসতি প্রদান করেন। তাম্বুলিগণ খাঁটুরাগ্রামে বসবাস আরম্ভ করিলে পর, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনগণকেও দূরবর্ত্তী গ্রামসকল হইতে ঐ গ্রামে আসিতে আহ্বান করেন। তদনুসারে আনুমানিক ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ১০৭০ সালে মহেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বেড়েলা বৈঁচি হইতে এখানে আনীত হন। বড়বাড়ীর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের আদিপুরুষ রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই সময়ে বেড়েলা বৈঁচি হইতে এই গ্রামে উঠিয়া আইসেন।

কেবল যে সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবস্থায় এইরূপে কুশদ্বীপসমাজ তাম্বুলি উপাদানে গঠিত হয়, তাহা নহে। পরন্তু বর্গীর হাঙ্গামা কালেও বিস্তর তাম্বুলি আসিয়া এখানে বাস করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

নবাব আলিবর্দ্দিখাঁর রাজত্ব। যদিও বর্গীর হাঙ্গামা পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাবগণের সময় হইতেই মহামারীরূপে বঙ্গদেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, তথাপি এই দশবৎসরকাল বঙ্গদেশের পক্ষে যে কি কালরাত্রি স্বরূপ ছিল, তাহা বলা যায় না। এই সময়ে যে কত পরিবার গৃহচ্যুত, প্রাণে নষ্ট, অনাহারপীড়িত ও দিক্ বিদেশে পলায়িত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। শুদ্ধ তাম্বুলিগণের কেন, বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণের বর্ত্তমান বসবাসের মূল কারণ অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে বর্গীর হাঙ্গামা তাহার কারণ। যখন দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রবাহিনী ভীষণ মুখব্যাদান করিতে করিতে যবনকর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর ভগ্নাবশিষ্ট ধনপ্রাণ গ্রাস করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়া নেপোলিয়ান্ নিপীড়িত ইউরোপবাসীর ন্যায় সন্ত্রস্ত ও শশব্যস্ত করিয়া তুলে, তখন যে যেদিকে পাইয়াছিল, সে সেই দিকেই পলাইয়াছিল। আজিকালি পেলেগভয়ে ভীত হইয়া কলিকাতাবাসীগণ যেমন পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনী লইয়া দেশদেশান্তরে প্রস্থানপর হইয়াছে, এবং কলিকাতার বহির্ভাগে আসিয়া অপেক্ষাকৃত ভীতিশূন্য গন্তব্যস্থান অন্বেষণ করিয়া লইতেছে, বর্গীবিধ্বস্ত অথবা বর্গীভয়াকুল বাঙ্গালীও তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান সকল অন্বেষণ করিয়া লইয়াছিল। কুশদহ পরগণার মধ্যে খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর, ইছাপুর, প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম তৎকালে প্রকৃতিদেবী সহজেই দুরাক্রম্য করিয়াছিলেন। এই কয়েকখানি গ্রামের দক্ষিণদিকে বেগবতী স্রোতস্বতী ইছামতীর সঙ্গে যমুনানদী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং প্রসন্নসলিলা খরস্রোতা চালুন্দিয়া নাম্নী অপর এক হ্লাদিনী বিপক্ষের বল উপেক্ষা করিয়া ও শত শত পণ্যপোত বক্ষে লইয়া ইহার অপর তিনদিক্ সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। কালের কুটিলগতিতে যদিও শেষোক্ত হ্লাদিনী নিয়তির অন্তঃস্তল স্পর্শ করিয়াছে, তথাপি আজিও ইহার কোন কোন অংশ নানাবিধ বিলখালে পরিণত হইয়া দুর্ভাগ্যের কঠোর পরিণাম প্রদর্শন করিতেছে। ইহারই কিয়দংশ আজও "কঙ্কণা" বা "বামোড়" নাম পরিগ্রহ করিয়া খাঁটুরা ও হয়দাদ্পুরের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বর্গীর হাঙ্গামাকালে চতুর্দ্দিক জলবেষ্টিত ও বংশবন সমাকীর্ণ দুরাক্রম্য স্থান সকলই সাধারণ ভদ্রমহাশয়গণের বাসোপযোগী বলিয়া নির্ণীত হইত।

তদনুসারে তাম্বুলিগণ খাঁটুরা ও গোবরডাঙ্গা গ্রামই সমধিক বাসোপযোগী বলিয়া মনোনীত করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইছাপুরের চৌধুরী মহাশয়েরা তাম্বুলিগণকে পূর্ব্বোক্ত মল্লিকপুর, বনগ্রাম, বড়া, কড়েলা প্রভৃতি স্থান হইতে আনাইয়া চতুর্দ্দিক জলবেষ্টিত ও বর্গীগণের হঠাৎ অনাক্রমণীয় গ্রামে বাস প্রদান করেন। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা উক্ত কয়েক বংশীয় তাম্বুলির নাম নিম্নে নির্দ্দেশ করিলাম। এই তাম্বুলিগণ যে যে স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহাদের নামানুসারে খাঁটুরা গ্রাম এক এক বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই খাঁটুরার প্রত্যেক পল্লীতে এক এক বংশীয় ভিন্ন অপর বংশীয় তাম্বুলী দৃষ্টিগোচর হয় না। খাঁটুরা প্রধানতঃ আশপাড়া, পালপাড়া, দাঁপাড়া, সেনপাড়া, বাজারপাড়া, রক্ষিতপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, তিওরপাড়া, কলুপাড়া, নিকারিপাড়া, কাওরাপাড়া, হাড়িপাড়া, ও কুমারপাড়া, এই কয়েক ভাগে বিভক্ত।

খাঁটুরাতে নিম্নলিখিত কয়েক ঘর তাম্বুলী প্রথমে বাস করেন। যথা:— দত্ত (১); সেন (২); আশ (৩); রক্ষিত (৪); চেল (৫); পাল (৬); দে (৭); কোঁচ (৮); কুণ্ডু (৯) এবং কর (১০)।

* খাঁটুরা গ্রামের যৎকালে সমৃদ্ধ অবস্থা ছিল, তখন গোবরডাঙ্গা নিতান্ত হীনাবস্থ ছিল। খাঁটুরাতে তৎকালে একটী প্রসিদ্ধ বাজার ও একটী নিমক্ মহল ছিল। ঐ বাজারটী এক্ষণে "পুরাতন বাজার" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ বাজারের দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিয়াই, তদানীন্তন আর আর সন্নিহিত গ্রামবাসীগণের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত। গোবরডাঙ্গায় যেমন বর্ত্তমান বাজার আছে, খাঁটুরাতে ঐরূপ বাজার ছিল। অনুমান ১২৪৭ বঙ্গাব্দে কমল কর্ম্মকারের দোকানে প্রথমতঃ অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া যায়। পরে গোবরডাঙ্গার জমীদার কালীপ্রসন্ন বাবু গোবরডাঙ্গায় বাজার প্রবল করাতে ক্রমে ক্রমে এই বাজার ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়া এক্ষণে একেবারে লোকদৃশ্যের অগোচর হইয়াছে। এক্ষণে খাঁটুরা আমতলার হাটে বাজার হয়। সন ১২০৩ সালে ৺ শ্যামাচরণ সেনের দ্বিতীয় পত্নী বিনোদিনী দাসী ঐ স্থানে চাঁদনী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

কমল কর্ম্মকারের অগ্নিদাহের পর হইতে তাম্বুলিগণ দুই এক জন করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বদেশের মমতা ত্যাগ করিয়া বিদেশে উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করেন। সর্ব্ব প্রথমে রাজকুমার আশ মহাশয় বরাহনগরে উঠিয়া আসেন। তৎপরে তাঁহার দেখাদেখি শরচ্চন্দ্র সেন, হারাণচন্দ্র পাল, দর্পনারায়ণ প্রভৃতিও বরাহনগরে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

তৎকালে এদেশে, তাম্বুলি ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যেরূপ সৌহার্দ্দ্য দেখা যাইত, এরূপ আর কুত্রাপিও ছিল না। তখন তাম্বুলিগণই খাঁটুরায় ব্রাহ্মণগণের শ্রীবৃদ্ধির কারণ ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণগণও তাম্বুলিগণের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিতেন। উভয় পরিবার পরস্পরের এতদূর হিতার্থী ও সুহৃদ্ ছিলেন, যে শুদ্ধ মাত্র পাকপৈতার প্রভেদ ভিন্ন ইহাদিগকে অন্য কোন রূপে প্রভেদ বলিয়া বোধ হইত না। উভয়ে উভয়কে এতদূর প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, যে একটী সামান্য তাম্বুলিতনয়ের জন্য গ্রামস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলী প্রাণবিসর্জ্জন করিতে ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

কিন্তু হায়! এক্ষণে আর সে দিন নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ ও তাম্বুলীগণ এক স্থানে আহার, একাসনে শয়ন, এক স্থানে উপবেশন, এক লক্ষ্যে লক্ষ্যবান্. একার্থে অর্থবান্ এবং একের জন্যে অন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন, আজি কালি সহানুভূতির অভাবে কেহ কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। বর্ত্তমান তাম্বুলিগণের পূর্ব্বপিতামহগণ ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে আহারে, বিহারে, শয়নে, উপবেশনে, দানে, দীক্ষায়, এমন কি, সামান্য ষষ্ঠী পূজা হইতে বৃহৎ বৃহৎ ক্রিয়া কাণ্ডে হোতা, তন্ত্রধার ও সর্ব্বময় কর্ত্তা করিতেন। সেই জন্যই এখানকার ব্রাহ্মণমণ্ডলী গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। তাম্বুলিগণ বাণিজ্যের অনুসরণ করিয়া যেমন একদিকে লক্ষ্মীদেবীর বরপুত্ররূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিলেন, তেমনি অন্য দিকে এখানকার ব্রাহ্মণ মণ্ডলীও নির্ব্বিঘ্নে শাস্ত্রানুশীলন করিয়া সরস্বতীর বরপুত্ররূপে পরিণত হইতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং এই উভয়জাতির সম্মিলিত চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ে খাঁটুরা গোবরডাঙ্গাও এক সময়ে কুশদহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

এক্ষণে খাঁটুরা গ্রাম তাম্বুলিগণের বাণিজ্য প্রভাবে যেমন মহাধনশালী

হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে উহার অবস্থা অন্যরূপ ছিল। তাম্বুলিগণ আজন্ম ব্যবসায়-প্রিয়; কিন্তু আজিকালিকার ন্যায় তৎকালে কাহারও কোন নির্দ্ধারিত ব্যবসায় বা আড়তাদি ছিল না। শিমূলপুব, মধুসূদনকাটি, বিষ্ণুপুর, বড়া, কড়েলা, মল্লিকপুর প্রভৃতি যে সকল স্থান হইতে উহারা ইছাপুরের চৌধুরী মহাশয়গণের যত্নে খাঁটুরায় আসিয়া বাস করেন, সেই সেই স্থানে তাঁহারা এক একটী গোলাবাড়ী ও থামার করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই থানে গিয়া তেজারতি ও মহাজনী কার্য্য করিতেন।

মহেশচন্দ্র দত্ত হইতে ফকির চাঁদ দত্তের সময় পর্য্যন্ত খাঁটুরার তাম্বুলিগণ এইরূপে মহাজনী ও তেজারতি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তৎপরে ফকিরচাঁদের সময় হইতেই ইহারা কলিকাতায় দোকান ও আড়তাদি করিয়া প্রকৃত ব্যবসায়ী হইতে আরম্ভ করেন ও বিপুল ধনসম্পত্তি লাভ করিয়া লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে পরিগণিত হন। আমরা শুনিয়াছি, ফকিরচাঁদ দত্ত প্রথমে বলদে করিয়া চাঁছড়িয়া প্রভৃতি স্থান হইতে ধান্যাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া খাঁটুরার বাজারে বিক্রয় করিতেন। খাঁটুরার দত্ত পরিবারেরা আজিও বিজয়াদশমী যাত্রার দিনে, ফকিরচাঁদ ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের সময় হইতে রক্ষিত কতকগুলি ছালা মাঙ্গল্য দ্রব্যরূপে প্রথমতঃ দর্শন ও প্রণাম করিয়া, পুরোহিত ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণের বাটীতে প্রণামাদি করিতে যাত্রা করিয়া থাকেন।

ভিন্ন সমাজের কন্যা গ্রহণ।

	গৃহীতা।	দাতার শ্রেণী।	গোত্র।	উপাধি।	বাসস্থান।	নাম।
১।	হরিচরণ সেন	৪২ গ্রামী	সপ্তর্ষি	নাগ	সন্দ্বিপুর	মধুসূদন নাগ
২।	ক্ষেত্রমোহন পাল	„	কাশ্যপ	রক্ষিত	উদয়গঞ্জ	রাধানাথ রক্ষিত
৩।	রামতারণ আশ	„	শাণ্ডিল্য	রক্ষিত	রামকৃষ্ণপুর	কেনারাম রক্ষিত
৪।	মঙ্গলচন্দ্র রক্ষিত	„	মধুকৌল্য	সেন	একলকী কোমরগঞ্জ	মানিকচন্দ্র সেন
৫।	হরিমোহন সেন	„	কাশ্যপ	রক্ষিত	রামচন্দ্রপুর	গোপালচন্দ্র রক্ষিত
৬।	চণ্ডীচরণ রক্ষিত	„	সপ্তর্ষি	কুণ্ডু	বালি দেওয়ান গঞ্জ	গুরুচরণ কুণ্ডু
৭।	রাজ্যেশ্বর রক্ষিত	„	শাণ্ডিল্য	কুণ্ডু	সাঁড়ুয়া (বর্দ্ধমান)	রামধন কুণ্ডু
৮।	যজ্ঞেশ্বর রক্ষিত	„	„	রক্ষিত	রামকৃষ্ণপুর	কেনারাম রক্ষিত
৯।	হীরালাল রক্ষিত	„	„	„	„	„
১০।	বিষ্ণুপদ রক্ষিত	৮ গ্রামী	„	দে	কলিকাতা, রামবাগান	মাধবচন্দ্র দে
১১।	বেণীমাধব দাঁ	৪২ গ্রামী	„	রক্ষিত	রামকৃষ্ণপুর	কেনারাম রক্ষিত
১২।	গোপালচন্দ্র রক্ষিত	„	পরাশর	দত্ত	সিলুট নবগ্রাম	রাসবিহারী দত্ত
১৩।	৺ আদাড় সেন	„	„	সিংহ	কল্মীঘোড়	যজ্ঞেশ্বর সিংহ
১৪।	৺ ষষ্টিচরণ রক্ষিত	৪২ গ্রামী	কপিলর্ষি	দে	জাড়া (মেদিনীপুর)	শ্রীমন্তচন্দ্র দে
১৫।	৺ নৃত্যগোপাল দত্ত	„	শাণ্ডিল্য	সেন	কল্মীঘোড়	গোলকচন্দ্র সেন

১৬। ৺ গোপালচন্দ্র পাল	”	”	”	”		”
১৭। ৺ বঙ্কুবিহারী সেন	...	...	...	...	...	...
১৮। ৺ রামকৃষ্ণ চেল	...	...	...	...	...	...
১৯। ৺ উমাচরণ রক্ষিত	...	...	...	...	...	..
২০। ভগবানচন্দ্র দাঁ	...	...	..	...	...	...
২১। ৺ গোপীমোহন রক্ষিত	...	...	...	...	...	...
২২। চন্দ্রনাথ রক্ষিত	৪২ গ্রামী	মধুকৌল্য	দত্ত	থানাকুল কৃষ্ণনগর	...	মধুসূদন দত্ত

১৪ গ্রামী সমাজের ন্যায় সপ্তগ্রামী সমাজে ভিন্ন শ্রেণীর কন্যা গ্রহণকারীকে কিয়দ্দিন পতিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হয়। সন্তানাদি হইলে ক্রমশঃ সমাজে তাহাদের অন্ন ও বালক বালিকার পরিণয় চলিত হইতে দেখা যায়।

কুশদহের সপ্তগ্রামী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্য সূচক উপাধি।
শ্রীরামগোপাল আশ	খাঁটুরা	জমিদারী	আশ	„	শাণ্ডিল্য	„	প্রামাণিক আশ
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	খাঁটুরা	জমিদারী ও পাটের বেলারি	দত্ত	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীবিহারিলাল দত্ত	খাঁটুরা	চাকরী	দত্ত	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীসত্যপ্রিয় কোঁচ	হয়দাদপুর,	ভূসম্পত্তি ও ব্যবসায়	কচ	„	মধুকৌল্য	কচ শব্দের রূপান্তর কোঁচ	
শ্রীভূতনাথ পাল বি, এ,	খাঁটুরা	পাটের ব্যবসায়	পাল	„	মধুকৌল্য	„	„
শ্রীসহায় নারায়ণ পাল	খাঁটুরা	লৌহের ব্যবসায়	পাল	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীগোপালচন্দ্র পাল	খাঁটুরা	চিনির ব্যবসায়	পাল	„	কাশ্যপ	„	„
শ্রীউমেশচন্দ্র রক্ষিত	কাশী	ভূসম্পত্তি	রক্ষিত	„	কাশ্যপ	„	দামপাল রক্ষিত
শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত	খাঁটুরা	চিকিৎসা	রক্ষিত	„	কাশ্যপ	„	বড় রক্ষিত
শ্রীশরৎচন্দ্র রক্ষিত	খাঁটুরা	দেশী চিনির ব্যবসায়	রক্ষিত	„	কাশ্যপ	„	প্রামাণিক রক্ষিত
শ্রীহরিপদ রক্ষিত	খাঁটুরা	ঘৃতের ব্যবসায়	রক্ষিত	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীদিননাথ দাঁ	বরাহনগর	চিনির ব্যবসায়	দাঁ	„	মধুকৌল্য	„	„
শ্রীপাঁচকড়ি সেন	বরাহনগর	সৈনিক চুক্তি	সেন	কর্ণপুর	শাণ্ডিল্য	„	কর্ণমুনী সেন

শ্রীঅবলাকান্ত সেন	খাঁটুরা	সাহিত্য সেবা	সেন	„	কাশ্যপ	„	„
শ্রীশশীভূষণ কুণ্ডু	গোবরডাঙ্গা	ব্যবসায়	কুণ্ডু	„	সপ্তর্ষি	„	„
শ্রীপ্রসন্নকুমার দে	শান্তিপুর	বৈদেশিক চিনির যোজকতা	দে	„	কপিলর্ষি	„	„
শ্রীহরিদাস দে	শান্তিপুর	পুস্তকের ব্যবসায়	দে	চাকুলে	কাশ্যপ	„	চাকুলের দে
শ্রীমহানন্দ দত্ত	খাঁটুরা	ঘৃতের ব্যবসায়	দত্ত	„	শাণ্ডিল্য	„	„

দুবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রামী।

দুবরাজপুরে এই সম্প্রদায়ের কত দিনের বাস, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। ইহারা আপনাদিগের সমাজকে পল্লীগ্রামী সমাজ কহেন। এদিকে আবার বলিয়া থাকেন বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই স্থানে বসবাস হইয়াছে। বীরভূম ও নয়াদুমকার অন্তর্গত নানা স্থানে ইহাদিগের কুটুম্ব দৃষ্ট হয়। ৭০।৮০ বৎসর গত হইল, জন সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় জীবিকার প্রশস্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধানার্থ দুবরাজপুর হইতে কয়েকটী দল নয়াদুমকায় বাস পরিবর্ত্তন করেন। ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। বৈশাখী পূর্ণিমায় কুল পূজার সময় ইহারা জাতীয় বৃত্তির সহায় স্বরূপ জাঁতি, কাতারি, চূণের ঘট প্রভৃতি কুলদেবতার নিকট রক্ষা করেন। ঐ দিন আবাল বৃদ্ধ কেহ পান বা সুপারি ব্যবহার করেন না। পুরোহিতের দ্বারাই ঐ পূজা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

নয়াদুমকার অন্তর্গত রসিকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তলাল দে এই সমাজের এক জন বিশিষ্ট জমীদার। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহারাণচন্দ্র দে বি, এল, এক জন উৎসাহী যুবক। দুমকায় ইনি ব্যবহারাজীবের কর্ম্ম করিয়া থাকেন। এই সমাজের মধ্যে দে বংশই বিদ্যা ও ধনে আদর্শ পরিবার। এই সমাজ ৬৪৮ ঘরে নামেও কথিত। উপরোক্ত ৬৪৮ ঘর আবার তিন অংশে বিভক্ত। দুবরাজপুর, যশপুর ও হেতমপুর সমাজ। বিবাহ বা অন্য কোন ক্রিয়া উপলক্ষে যাঁহারা ৬৪৮ ঘর কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করিতে অশক্ত, তাঁহারা উপরোক্ত তিন সমাজের মধ্যে যে কোন একটি সমাজ লইয়া ক্রিয়া সমাধা করিতে পারেন।